সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অন্য জীবনের স্বাদ



। বাবা দীনেশ এক সময় শিক্ষকতা
দিন কাটাতেন। তখন শিক্ষকদের
খুবই কম। অতএব, টানাটানির
াহের বড় হয়ে উঠেছে। তার স্ত্রী শান্তাও
মহিলা। শহরের জীবন অফিস-নির্ভর।
বাড়ি—এর বাইরে সে বিশেষ
া না। এমন একজন ঘরকুনো মানুষের
কস্মাৎ বদলে যেতে শুরু করল।
য়েটার রোডে বাবার মাসতুতো ভাই
ও তাঁর স্ত্রী জুলির অ্যাপার্টমেন্টে এসে
ন হল, তার চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে
াগতের দরজা। চেনাগণ্ডির বাইরে এই
কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। এই ফ্ল্যাটের
এবং এখানে যারা পার্টিতে-নিমন্ত্রণে
তাদের সে কখনও এত কাছ থেকে
ক সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর
ভিন্ন এক পৃথিবী, সেখানকার জীবন ও
বি আঁকা হয়েছে এই আশ্চর্য

7756-025-5

ইদানীং জহর অফিসের পর বেশ দেরি করে বাড়ি ফেরে। আগে তার সব কিছুই ছিল নিয়মে বাঁধা।

আদিমকালের গুহাবাসী মানুষদের থেকে একালের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার খুব বেশি তফাত ঘটেনি। আদিম মানুষেরা গুহা ছেড়ে বেরুত শিকারের সন্ধানে, সারাদিন শিকার-টিকার করে অন্ধকার হওয়ার আগেই ফিরে আসত গুহায়। এখন শুধু ওই শিকারের নাম হয়েছে জীবিকা নির্বাহ। জহরের মতন মানুষদের সকাল থেকেই চলে অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি। দাড়ি কামানো, স্নান, হুড়ুস-ধাড়ুস করে খাওয়া। ন'টা কুড়ির ট্রেন ধরতেই হয়। স্টেশন পর্যন্ত সাইকেল রিকশায় গেলে বারো মিনিট, হেঁটে গেলে পঁচিশ, শর্ট কাট আছে, মাসের শেষের দিকে সে হেঁটেই যায়। অফিস ছুটির পর প্রতিদিন প্রায় একই সময়ে বাড়ি ফেরা। তার নিজস্ব গুহায়।

অফিস-নির্ভর জীবন। স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ বাবা-মা, এই নিয়ে একটা ছোট্ট গণ্ডি, তার বাইরে আর বিশেষ কিছু নেই। কদাচিৎ সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাওয়া, তাও এখন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেও টি ভি এসেছে, বাড়িতে বসেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে।

সম্প্রতি জহর একটা অন্য জগতের সন্ধান পেয়েছে। এখন অফিসের চেয়েও অফিস ছুটির পর সেই জায়গাটা তাকে বেশি টানে।

এর সূত্রপাত মাস তিনেক আগে।

জহরের মা নেই, বাবা বেঁচে আছেন। দীনেশ স্কুল শিক্ষক ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত ভাঙা চেহারার বৃদ্ধ, কিন্তু মেজাজটি সেকেলে অঙ্কের মাস্টারের মতনই। বাড়িতে তো বটেই, পাড়ার লোকদের সঙ্গেও যে-কোনও ছুতোয় খিটিমিটি বাধাতে ভালবাসেন। আর প্রচুর চিঠি লেখেন বাংলা খবরের কাগজে, কিছু কিছু ছাপাও হয়, দেশের সব কিছুর বিরুদ্ধেই তাঁর তীব্র মতামত আছে। এখনকার স্কুল শিক্ষকদের মাইনে অনেক বেড়ে ভদ্রস্থ হয়েছে। দীনেশরা সে সুযোগ পাননি। সে জন্যও তাঁর অনেক ক্ষোভ জমা আছে, তাই যে-কোনও উপলক্ষে একালের শিক্ষকদের আদর্শহীনতার প্রতি বিষোদ্গার করতে ছাড়েন না। দীনেশ নিজে যে খুব একটা আদর্শবাদী ছিলেন তা নয়, অন্য কোনও চাকরি না পেয়ে বাধ্য হয়ে

ঢুকেছিলেন মাস্টারিতে, যে-সব ছেলেদের প্রাইভেট টিউশানি করতেন, শত অগা মার্কা হলেও তাদের অঙ্কের খাতায় বেশি নম্বর পড়ত।

বাড়িতে একটিই কাগজ রাখা হয়। সেটার আদ্যোপান্ত তো খুঁটিয়ে পড়েনই, পাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়ে দীনেশ পড়ে আসেন আরও দু'তিনটি কাগজ। সবরকম অনাচারের খবর পাঠ না করলে তিনি চিঠি লেখার বিষয় খুঁজে পাবেন কী করে? বিকেলবেলা একটা কোচিং ক্লাসে তিনি অঙ্ক পড়াতে যান, সেখানে থাকে একটি ইংরিজি দৈনিক, সেটি তিনি ফেরার সময় বগলদাবা করে নিয়ে আসেন। ওরা দিয়ে দেয়। সেই ইংরেজি পত্রিকাটি তাঁর রাত্তিরের পাঠ্য।

এক রাত্তিরে, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে, টি ভি-তে একটা সিরিয়াল দেখছে জহর, ছেলেমেয়ে দুটিকে টি ভি-র ঘর থেকে সরিয়ে বিছানায় নিয়ে যেতে ব্যস্ত শান্তা, দীনেশ ইংরিজি পত্রিকাটি নিয়ে এসে বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ ছকু, এই খবরটা পড়ে দ্যাখ, মনে হচ্ছে এ আমার ভাই!

ঠিক খবর নয়, একটা দু'কলম ছবির নীচে তিন লাইন ক্যাপশান। ফুলবাগান অঞ্চলে পথ-শিশুদের জন্য একটি স্কুল ও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, তাতে যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রশান্ত বসু। অনেকগুলি বাচ্চার সঙ্গে কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ, ছবিটি তেমন স্পষ্ট নয়।

দীনেশ বললেন, আমার মাসতুতো ভাই বাপি, তারই তো ভাল নাম প্রশান্ত, সে ডাক্তার হয়েছিল, ওদের অবস্থা ভাল ছিল তো, তারপর প্রশান্ত আর্মিতে জয়েন করল, আর্মির ডাক্তার হয়ে আম্বালা না লুধিয়ানা কোথায় যেন থাকত, অনেকদিন যোগাযোগ নেই। সেই প্রশান্ত তা হলে কলকাতায় ফিরে এসেছে!

জহর বলল, বাবা, তুমি কি ছবিতে চিনতে পারছ? প্রশান্ত বোস খুব কমন নাম, ওই নামে অনেক ডাক্তারই থাকতে পারে। তোমার কোনও মাসতুতো ভাইয়ের কথাও তো আগে শুনিনি।

দীনেশ আমতা আমতা করে বললেন, ছবিটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছে, দেখি এই পত্রিকায় চিঠি লিখলে যদি ঠিকানাটা জানাতে পারে।

ব্যাপারটা খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছিল জহরের। বহুকাল যোগাযোগ নেই এমন একজন মাসতুতো ভাই কলকাতায় ফিরে এসেছে কি আসেনি, তা নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে? জহরের নিজের মাসতুতো তিন ভাই থাকে সোনারপুরে, তাদের সঙ্গে দেখাই হয় না।

এমনকী মশাগ্রামে দিদির শ্বশুর বাড়িতেই যাওয়া হয়নি কতদিন।

দীনেশের আর একটি দুর্বলতা নেমন্তন্ন বাড়িতে যাওয়া।

এক সময় বলা হত, খুব বেশি দিন গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে মাস্টারের নিজেরই শেষ পর্যন্ত কান বড় হয়ে যায় আর নাক লম্বা হয়। এখন সে রকম হোক বা না হোক, রক্তে চিনি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদরোগ অধিকাংশ শিক্ষকেরই অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। দীনেশের ওই তিনটিই আছে। সুতরাং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি। পুত্রবধূ তাঁকে রোজ করলার রস দিতে ভোলে না। এবং চায়ে চিনি মেশাতে দেখলেই বাধা দেয়। দুপুরে খাওয়ার সময় দীনেশ লোলুপভাবে তাকিয়ে থাকলেও শান্তা কিছুতেই দু'হাতার বেশি ভাত দেবে না, রাত্রে মাত্র দু'খানা রুটি। স্টেশানের কাছে মিষ্টির দোকানে দীনেশ কখনও কখনও লুকিয়ে খেতে গেলেই পাড়ার কেউ না কেউ দেখে ফেলে, বাড়িতে জানিয়ে যায়, শান্তা রীতিমতন ধমক দেয় শ্বশুরকে।

দীনেশ সব পুষিয়ে নেন নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন বা প্রাক্তন ছাত্র যে কেউ দায়সারা নেমন্তন্ন করলে দীনেশ যাবেনই। অবশ্য খুব বেশি দূর না হলে। এই শরীর নিয়ে তাঁর একা একা চলাফেরার সাহস নেই, তাই প্রায় জোর করে সঙ্গে নিয়ে যান নাতিকে। জহর তো কোথাও যেতে চায় না, অফিস থেকে একবার বাড়ি ফিরে প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরে নিলে সে আর কোথাও বেরুবে না।

প্রাক্তন অঙ্কের শিক্ষক দীনেশ ছেলেকে হিসেব বোঝাবার চেষ্টা করেন। নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে উপহার নিতে হয়, বেশ তো, একখানা বই, বড় জোর চল্লিশ টাকা, যাতায়াত ভাড়া আরও তিরিশ, এখন বিয়ে বাড়িতে ক্যাটেরারের খাওয়া অন্তত আশি-নব্বই টাকা প্লেট, সঙ্গে আইসক্রিম থাকলে আরও বেশি, তা হলে, আমরা যদি দু'তিন জন যাই...

জহর হাসতে হাসতে বলে, বাবা, এই বয়েসেও তোমার লোভ কিছুতেই গেল না।

দীনেশ উত্তর দেন, এই বয়েসে মানে কী, আগে আমার মোটেই লোভ ছিল না, তোরা যখন ছোট ছিলি, অভাবের সংসার, তখন কী-ই বা খেয়েছি, দিনের পর দিন নিরামিষ...মানুষের যতই দিন ফুরিয়ে আসে, ততই লোভ বাড়ে।

দমদমের এক বিয়ে বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরেই দীনেশ মহা উৎসাহে ছেলেকে বললেন, ওখানে কার সঙ্গে দেখা হল জানিস? তোকে

বলেছিলাম না, আমার মাসতুতো ভাই বাপি, সেই যে ডাক্তার প্রশান্ত বোস, আর্মি থেকে রিটায়ার করে ওদিক থেকে চলে এসেছে। সেট্‌ল করেছে কলকাতায়। কী সুন্দর লম্বা-চওড়া চেহারা, আমাকে দেখা মাত্র চিনতে পারল, বলল, বটুদা না? ওর বউও সঙ্গে ছিল, প্রণাম করল আমাকে। যার বিয়ে হল, সে তো আমার আর এক মাসতুতো বোনের মেয়ে, তাই ওদেরও নেমন্তন্ন... একদিন সবাইকে নিয়ে যেতে বলল ওদের বাড়ি, ঠিকানা লিখে দিয়েছে, এটা তোর কাছেই রাখ।

ঠিকানা লেখা কাগজটা হাত বাড়িয়ে নিল জহর। এমনিই চোখ বুলিয়ে দেখল। ঠিকানাটা তার চেনা।

জহরের অফিস সল্ট লেকের কাছে। উল্টোডাঙা স্টেশনে নেমে হেঁটে যেতে হয়। বেসরকারি কম্প্যানি, পানীয় জল পরিশোধক একটি যন্ত্র বানায়, জহর সেখানে একজন টেকনিশিয়ান। কারখানার সঙ্গেই অফিস, যন্ত্রটা যারা কেনে, সেইসব গ্রাহকদের পরিষেবারও ব্যবস্থা আছে। জহরের যদিও কারখানাতেই কাজ, তবু মাঝে মাঝে তাকে বাইরেও যেতে হয়। কিছু ছেলেকে ট্রেনিং দেওয়া আছে। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে যন্ত্রটি পরীক্ষা করে আসে, স্যার্ভিসিং-এর ব্যবস্থা করে। কোথাও বড় রকমের ত্রুটি দেখা দিলে কম্পানি তখন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পাঠায় জহরকে।

এই কাজে থিয়েটার রোডের 'সোনার তরী' নামের বাড়িটিতে জহরকে দু'একবার যেতে হয়েছে। বিশাল বাড়ি, একশো'র বেশি অ্যাপার্টমেন্ট, তারই একটিতে থাকেন ডাক্তার প্রশান্ত বসু।

বেশ কয়েকদিন সেখানে যাবার জন্য দীনেশের খুব আগ্রহ ছিল। মাসতুতো ভাইকে দিয়ে বিনা পয়সায় হৃদযন্ত্রটি পরীক্ষা করিয়ে নেবারও সাধ ছিল, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। কে নিয়ে যাবে? জহর রাজি হবে না জানাই কথা, রবিবার বা ছুটির দিনে সে কোথাও যাবে না, শুধু অনর্গল টি ভি দেখবে। আট বছরের নাতিকে নিয়ে অতদূর যাওয়া যায়? বাড়ি থেকে সাইকেল রিকশায় নৈহাটি স্টেশন, তারপর ট্রেনে চেপে শিয়ালদা, সেখান থেকে আবার কোন বাস থিয়েটার রোড যায় কে জানে। শিয়ালদা স্টেশানে নামলেই কেমন যেন দিশেহারা লাগে আজকাল। যেন সব সময় গাজনের মেলা চলছে।

সেই মাসতুতো ডাক্তারের প্রসঙ্গ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই চাপা পড়ে গেল।

অনেক ছোটখাটো অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মানুষের জীবন বদলে যায়। এমনকী অনেক রাষ্ট্রেরও ইতিহাস বাঁক নেয় অন্যদিকে। হঠাৎ বরফ পড়তে

শুরু করায় নেপোলিয়ান রাশিয়ার যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন। আর এ মাসের বারোই জুন যদি অমন প্রবল বৃষ্টি না হত, কিংবা বৃষ্টি যদি আর এক ঘণ্টা পরেও নামত, তা হলে জহরের জীবনও ধরা বাঁধা পথেই থেকে যেত।

থিয়েটার রোডের এক বাড়িতে জলের যন্ত্র সারাতে গিয়েছিল জহর। কাজ শেষ হয়ে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে। লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বারান্দার এক প্রান্তে তাকিয়ে দেখল তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এখন বাইরে বেরুনো যাবে না। তা ছাড়া ক'দিন আগেই জহর জ্বরে ভুগেছে, এখন সে ভিজতে রাজি নয় মোটেই।

তখনই তার মনে পড়ল, এই বাড়িটাই তো সোনার তরী, এরই কোনও ফ্ল্যাটে থাকেন তার বাবার মাসতুতো ভাই, ডাক্তার প্রশান্ত বসু। মাসতুতো ভাই খুব একটা দূর সম্পর্ক নয়, তিরিশ বছর পর দেখা হওয়া মাত্র তিনি বাবাকে চিনতে পেরেছেন, তা হলে কি এই বৃষ্টির সময়টা ওঁর ফ্ল্যাটে কাটানো যায় না?

লিফ্‌ট এসে গেছে, ভেতরের দু'জন আরোহীরই সর্বাঙ্গ জবজবে ভেজা। জহর লিফ্‌টম্যানকে জিজ্ঞেস করল, ভাই, ডাক্তার প্রশান্ত বোসের ফ্ল্যাট নম্বরটা কত?

লোকটি মুখে কিছু না বলে একটা আঙুল ওপরের দিকে দেখাল।

আরও দুটি ফ্লোর উঁচুতে জহরকে নামার ইঙ্গিত করে লোকটি বলল, ডানদিকের কোণে।

দরজার গায়ে নেমপ্লেট আছে। জহর বেল বাজাল।

দরজা খুলে দিলেন একজন বয়স্কা মহিলা। পরিচ্ছন্ন, সাদা শাড়ি পরা, কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়া বা কাজের লোকও হতে পারে। প্রশান্ত বসুর স্ত্রী সাদা শাড়ি পরবেন কেন?

জহর জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার প্রশান্ত বসু আছেন?

মহিলাটি ঘাড় নেড়েও তাকিয়ে রইলেন জহরের মুখের দিকে।

জহর বলল, ওঁকে বলুন, ওঁর এক দাদা দীনেশ সরকারের কাছ থেকে এসেছি।

মহিলাটি এবার সরে গিয়ে বললেন, আসুন ভেতরে।

প্রথমে জুতো খোলার জায়গা। তারপর ডান দিকে বা বাঁ দিকে রান্না ঘর, তারপর একটা লম্বা হল ঘর মতন, যাকে এঁরা বলেন ড্রয়িং-ডাইনিং রুম, এই সব বাড়ির ফ্ল্যাটের গড়ন জহর জানে। সব প্রায় একই রকম।

বসবার ঘরে ঢুকে জহর আচম্বিতে বিস্ময়ের প্রতিমূর্তি হয়ে গেল।

সমস্ত জানলা বন্ধ ও পর্দা ঢাকা। বাইরে যে তুফান-বর্ষণ চলছে তা

বোঝার উপায় নেই। ঘরটি আধো-অন্ধকার, মাঝখানে একটা নিচু গোল টেবিল, তিন পাশ সোফা দিয়ে ঘেরা, অন্য প্রান্তে একটা মস্ত বড় পিয়ানো, একজন মহিলা পেছন ফিরে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। শাড়ি নয়, তিনি পরে আছেন ঘি রঙের একটা গাউনের মতন পোশাক, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, কাঁধ ও উন্মুক্ত হাত দুটির যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতেই বোঝা যায়, ওঁর গায়ের রং হাতির দাঁতের মতন।

জহরের মনে হল, সে একটা অবাস্তব জগতে ঢুকে পড়েছে। এ যেন টি ভি সিরিয়ালের দৃশ্য। কিন্তু এখানে তো তাকে মানায় না। সে নৈহাটির জহর সরকার, বি ডি এন্টারপ্রাইজ কম্পানির মেকানিক, সে এর আগে জলজ্যান্ত কাউকে কখনও পিয়ানো বাজাতে দেখেইনি, সে এখানে ঢুকে পড়ল কী করে? এইসব বাড়িতে সে যখন কাজের জন্য আসে, জলের যন্ত্রটি সবাই লাগায় রান্না ঘরে, সেই রান্না ঘর থেকেই সে ফিরে যায়, বসবার ঘরে কেউ কখনও তাকে ডাকেনি।

জহরের সারা শরীরে লজ্জার শিহরন হল। তার ভুল হয়েছে। এইরকম দুপুরবেলা অসময়ে কেউ আসে? প্রশান্ত বোস বাবার মাসতুতো ভাই হতে পারেন, কিন্তু তিনি তো জহরকে কখনও চোখেই দেখেননি। অবস্থার কত তফাত, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। গরিব আত্মীয়দের সঙ্গে বিয়েবাড়িতে দেখা হলে দু'চারটে কথা বলা যায়, ভদ্রতা করে বাড়িতে একদিন এসো, বলাও যায়, কিন্তু সত্যি সত্যি বাড়িতে এলে কি এরা খুশি হয়? জহরদের চেয়েও তো আরও গরিব আছে, জিতেন পিসেমশাইদের অবস্থা আরও খারাপ, দুটো ছেলেই বেকার, ঝন্টু প্রায়ই জহরের কাছে চাকরির জন্য ধরাধরি করতে আসে, জহর এখন তাকে দেখলেই বিরক্ত হয়। সে বাড়িতে এলে জহর শান্তাকে জানিয়ে দেয়, আমায় ডেকো না, বলে দিয়ো, আমি ঘুমোচ্ছি।

মহিলাটি জহরের উপস্থিতি টের পাননি। বাজাচ্ছেন তন্ময় হয়ে, সামনের দিকে ঝুঁকে, সারা ঘর যেন সুরে ভরে গেছে। জহর একবার ভাবল, এখন তার নিঃশব্দে সরে পড়াই উচিত। কিন্তু পিয়ানোর ধ্বনির এমন একটা মাদকতা আছে যে জহর তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

একটু পরে পাশের ঘর থেকে চটি ফটফটিয়ে বেরিয়ে এলেন একজন দীর্ঘকায় প্রৌঢ়। মাথার চুল কাঁচা পাকা, ধপধপে পা-জামা, পাঞ্জাবি পরা। জহরের দিকে তিনি সোজাসুজি তাকালেন।

জহর সঙ্কুচিত ভাবে বলল, আমার বাবা দীনেশ সরকার, দমদমের এক বিয়েবাড়িতে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল...আপনি নিশ্চয়ই

প্রশান্তকাকা, আপনার কথা বাবার কাছে অনেক শুনেছি—

ঝপাস করে জহর ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলল।

প্রশান্ত বসু বললেন, ও হ্যাঁ, বটুদা, অনেককাল পরে দেখা, তুমি তার ছেলে? বসো, বসো, তোমার নাম কী?

নাম জানিয়ে জহর আবার বলল, অসময়ে এসে পড়েছি, আপনি হয়তো ঘুমোচ্ছিলেন, আমি এ বাড়িতেই একটা কাজে এসেছিলাম—

প্রশান্ত বসু বললেন, আমি দিনের বেলা ঘুমোই না। দ্যাট্‌স আ ব্যাড হ্যাবিট। এসেছ বেশ করেছ। বটুদা মাস্টারি থেকে রিটায়ার করেছেন শুনলাম। বটুদা ছোটবেলায় আমাকেও পড়িয়েছেন, বোধহয় ক্লাস সিক্স-সেভেনে, তখন থেকেই ওঁর বেশ মাস্টার মাস্টার ভাব ছিল। অনেকবার গাঁট্টাও খেয়েছি। আমার থেকে বছর চারেকের বড়।

সেই বালক বয়েসের স্মরণে তিনি হাসলেন।

মহিলাটি এখনও বাজিয়েই চলেছেন। জহর ভাবল, ইনি কে? প্রশান্তকাকার মেয়ে? পুত্রবধূ?

প্রশান্ত বসু আবার বললেন, অনেককাল পরে কলকাতায় ফিরেছি তো, অল মোস্ট থ্রি ডিকেড্‌স, না, না, তারও বেশি, এখানকার আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় থাকে জানি না, কারও সঙ্গে দেখা হলে ভালই লাগে।

কথাবার্তা বললে মহিলার বাজনায় ব্যাঘাত হবার কথা, প্রশান্ত বসু তা ভাবছেন না, বেশ উঁচু গলাতেই কথা বলছেন। মহিলাও তাকাচ্ছেন না এদিকে।

এক সময়ে জোরে জোরে কয়েকবার ঝম ঝম ঝম ঝম করে তিনি থামলেন। বোধহয় সম্পূর্ণ করলেন কোনও একটা গান। তারপর তাকালেন পেছন ফিরে।

জহর ওঁকে তরুণী বলে ধরেই নিয়েছিল, এবার বোঝা গেল, তিনি প্রৌঢ়া। কিন্তু বয়েস ধরে রাখতে জানেন। স্নিগ্ধ, লাবণ্যময় মুখ, দীর্ঘ জীবনের কোনও ক্লান্তির ছাপই তাতে পড়েনি।

প্রশান্ত বসু বললেন, জুলি, এদিকে এসো। মিঠুর বিয়েতে যে বটুদার সঙ্গে দেখা হল, আমার মাসতুতো দাদা, এ তাঁরই ছেলে। হি হ্যাজ কাম টু পে আস আ ভিজিট।

জহর বুঝল, ইনিই কাকিমা। জুলি নাম? অবাঙালি নাকি? প্রশান্ত বসু ইংরিজি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলেন...

মহিলা উঠে এগিয়ে আসতেই জহর তাঁকেও প্রণাম করে ফেলল। তারপর বলল, আপনি এত সুন্দর বাজাচ্ছিলেন, আমি এসে ডিসটার্ব

করলাম!

মহিলা সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, সুন্দর বাজাচ্ছিলাম? আমি বাজাতে জানি নাকি? এই এত বয়েসে সবে শিখতে শুরু করেছি। সময় কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে টুং টাং করি।

তাঁর স্বামী বললেন, যাক, তবু একটা সার্টিফিকেট পেলে।

জহর বলল, আমি অবশ্য কিছু বুঝি না।

এরপর অমুক আর তমুক কে কোথায় থাকে, কার ছেলে কী কাজ করে, কার মেয়ের বিয়ে হয়েছে কি হয়নি, এইসব কথাই চলে কিছুক্ষণ।

এর মাঝখানেই একবার উঠে গিয়ে জুলি নিয়ে এলেন শরবত আর সন্দেশ। ফ্রস্টেড গ্লাস, দেখলে মনে হয়, গেলাসটির গায়ে ঠাণ্ডা জল জমে আছে, ওপরে লেসের ঢাকনা, লেসের পাশে পাশে লাল পুঁতি বসানো, সন্দেশ দুটি শঙ্খ আকারের, রং সবুজ।

এঁদের কথাবার্তা, এঁদের ঘর সাজানো, এঁদের শরবত-সন্দেশ পরিবেশন সব কিছুই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। জহরের কাছে সবই নতুন।

ঠিক কতক্ষণ বসা উচিত? এঁরা নিশ্চয়ই ভদ্রতা করছেন। সন্দেশ দুটি শেষ করে জহর বলল, আমি এবার উঠি।

জুলি বললেন, আরে বসো, বসো। দারুণ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, এর মধ্যে যাবে কী করে? রাস্তায় বোধহয় জল জমে যাবে।

প্রশান্ত বসু বললেন, এই এক নুইসেন্স! দু'দিন আগেও...কলকাতা শহরটা এত ডিটিওরেট করে গেছে, আমার কলকাতা পছন্দ নয়, এতকাল নর্থ ইন্ডিয়ায় থেকেছি, ওখানকার লাইফ স্টাইল অন্যরকম... তবে মিসেস বোসের কলকাতার ওপর এমন টান, উনি ইনসিস্ট করলেন বলেই

জুলি বললেন, বিয়ের পর বত্রিশ বছর তোমার সঙ্গে নর্থ ইন্ডিয়ায় কাটিয়েছি। শেষ জীবনটা নিজের লোকজনদের কাছে থাকতে ইচ্ছে করে না? দোকানপাটে তবু বাংলা কথা বলা যায়—

প্রশান্ত বসু বললেন, এ বাড়িটাতে তো বেশির ভাগই নন্ বেঙ্গলি। পুরো থিয়েটার রোডটাই তো দেখছি...। জহর, তুমি এ বাড়িতে একটা কাজে এসেছিলে বললে, কার কাছে?

জহর বলল, আমি একজন মিস্তিরি। আমাদের কম্পানি একটা ড্রিংকিংওয়াটার পিউরিফায়ার মেশিন বানায়। যারা কেনে, তাদের কারও মেশিনে কোনও মেকানিক্যাল ডিফেক্ট থাকলে আমি এসে দেখে দিয়ে যাই।

জহরের মুখে মিস্তিরি কথাটা শুনে প্রশান্ত বসুর মুখের একটি রেখাও

বদলাল না। তিনি বললেন, আমাদেরও তো একটা ওই মেশিন আছে। আলট্রা ভায়োলেট রে থাকে, তোমাদের কম্পানিরই হতে পারে। একবার দেখে নিয়ো তো ঠিকঠাক আছে কি না।

জুলি বললেন, তা হলে জহরকে মঙ্গলবার আসতে বলো না। জহর, তোমার মঙ্গলবার সন্ধেবেলা কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে? না থাকলে চলে এসো।

প্রশান্ত বসু বললেন, হ্যাঁ, কাজ না থাকলে চলে এসো। তোমার কাকিমা গান বাজনা ভালবাসেন, কিছুদিন শান্তিনিকেতনে পড়েছিলেন তো। মঙ্গলবার এখানে দু'জন গান গাইবে, দে আর সাপোজ্‌ড টু বি ফেমাস, আমি অবশ্য খবর রাখি না।

জুলি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে এসো। সেদিন রাত্তিরে এখানেই খেয়ে নেবে।

জহর বলল, আচ্ছা আসব।

জুলি আবার বললেন, এ পাড়ায় যদি আবার কোনও কাজে আসো, আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবে। কাকা-কাকিমার কাছে যখন খুশি চলে আসবে, লজ্জা পেয়ো না।

এমন আন্তরিক ব্যবহার জহর নিজের শ্বশুরবাড়িতেও কখনও পায়নি।

দুই

অফিস থেকে ফেরার অন্য একটা পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে জহর। বিকেল-সন্ধেবেলা উল্টোডাঙা স্টেশান থেকে ট্রেন ধরা মানে প্রতিদিন যুদ্ধ। শিয়ালদা থেকেই ট্রেন একেবারে গাদাগাদি হয়ে আসে, তার পরের স্টেশনের যাত্রীরা ঠেলাঠেলি করে কোনও রকমে ঢোকার চেষ্টা করে। এক-একদিন তাও পারা যায় না, একটা-দুটো ট্রেন ছেড়ে দিতে হয়, প্রায়ই জহরকে প্রাণ হাতে নিয়ে ঝুলতে ঝুলতে যেতে হয়েছে।

উল্টোদিকের ট্রেন ওই সময় বরং কিছুটা ফাঁকা থাকে। জহর উল্টোদিকের ট্রেনে চেপে শিয়ালদা চলে আসে, সেখানে নৈহাটি লোকালে বসবার জায়গা পেয়ে যায়। তার মান্থলি টিকিট আছে। কোনও অসুবিধে নেই। আগে এই উপায়টা মনে পড়েনি কেন? আরও কেউ কেউ তো এরকমই করে। আগে জহরের বাড়ি ফেরার তাড়া থাকত, অফিস থেকে কতক্ষণে ফিরে লুঙ্গিটি পরে বারান্দায় বসবে, সেটাই ছিল একমাত্র চিন্তা। এখন হঠাৎ সেই বাড়ির টান ঘুচে গেছে।

শিয়ালদায় এলে কিছু কিছু দরকারি জিনিস কেনাকাটি করা যেতে পারে। নৈহাটির তুলনায় অনেক কিছুই কলকাতায় একটু শস্তা। যেমন বিস্কুট, টুথপেস্ট, গুঁড়ো সাবান, বাচ্চাদের ফ্রক-জামা ঢেলে বিক্রি করে, দোকানের চেয়ে অর্ধেক দাম।

এক-একদিন শিয়ালদায় এসে ওসব কিছুই কিনতে ইচ্ছে করে না, একবার থিয়েটার রোড ঘুরে আসার জন্য মনটা ছটফট করে।

সে ফ্ল্যাটে তার অবারিত দ্বার। ইচ্ছে করলে রোজই যাওয়া যায়। প্রত্যেকদিনই সন্ধের সময় সেখানে ছোটখাটো আড্ডা বসে, গান বাজনা হয়। জহর অনেকভাবে যাচাই করে দেখেছে, সে ঘন ঘন গেলেও কাকা-কাকিমা একটুও বিরক্ত হন না। ওঁরা সত্যিই মানুষ-জনের সঙ্গ ভালবাসেন।

সেই প্রথম মঙ্গলবারের সন্ধ্যাটি জহরের জীবনে একটা বিশেষ প্রাপ্তি। যেন লটারির ফার্স্ট প্রাইজ। সেই রকমই তো। কোথায় ছিলেন এই কাকা-কাকিমা? জীবনের এতগুলো বছর কোনও যোগাযোগ ছিল না, জহর আগে এঁদের দেখেইনি, হঠাৎ ওঁদের বাড়িটাই হয়ে গেল জহরের প্রধান আকর্ষণ। আজকাল আত্মীয়তার সম্পর্কই বা কজন বজায় রাখে! সমাজের অনেকগুলি স্তর আছে, এক স্তরের মানুষ অন্য স্তরের মানুষদের সঙ্গে সামাজিক ভাবে মেলামেশা করে না। জহরদের তুলনায় প্রশান্ত বসুরা অনেক ওপরের স্তরের।

কয়েকদিন যাওয়া আসা করার পরই জহর বুঝতে পেরেছে, তার আত্মীয়তার দাবিটাও অবান্তর। ওখানে অন্য যারা আসে, সে তাদেরই একজন, সে কী চাকরি করে, কোথা থেকে আসে, এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এটা সম্ভব হয়েছে কাকিমার জন্য। তিনি একটা এমন সহজ, স্বাভাবিক আবহাওয়া তৈরি করে দেন! আশ্চর্য এই মহিলা, অত বড় একজন আর্মি অফিসারের বউ, যৌবনকালে খুবই রূপসী ছিলেন বোঝা যায়, এখনও তার রেশ রয়ে গেছে, ভাল লেখাপড়া জানেন, ইংরিজি বলেন ঝরঝরিয়ে, স্বামীর সঙ্গে দেশ-বিদেশে অনেক ঘুরেছেন, কত হোমরা-চোমরা লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর স্বভাবে অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেশেন, কী যত্ন করে সবাইকে খাওয়াতে চান। যেমন মিষ্টি তাঁর কণ্ঠস্বর, তেমনি মধুর তাঁর হাসি। ওই আড্ডায় আরও কয়েকজন মহিলা আসেন, কিন্তু প্রধান আকর্ষণ কাকিমাই।

জুলি নাম শুনে জহর প্রথমে অবাঙালি ভেবেছিল। আসলে ওঁর নাম বিজলি, হাটখোলার বিখ্যাত দত্তদের পরিবারের মেয়ে, তবে ছোটবেলা

কেটেছে এলাহাবাদে। বলতে গেলে সারাটা জীবনই থেকেছেন বাংলার বাইরে, শুধু দু'বছর ছিলেন শান্তিনিকেতনে, তাতেই বাংলা ভাষা ও বাংলা গানের প্রতি দারুণ টান রয়ে গেছে।

ডাক্তার প্রশান্ত বসুরও ব্যবহার আন্তরিক, কিন্তু অতটা খোলামেলা নয়। জহর জানত না যে সামরিক বাহিনীতে ডাক্তারদেরও র‍্যাঙ্ক থাকে। তিনি আসলে কর্নেল প্রশান্ত বসু। ডাক্তারদের নিশ্চয়ই লড়াই করতে হয় না। কিন্তু একটু মিলিটারি-মিলিটারি হাবভাব এসেই যায়। কর্নেলের কণ্ঠস্বর জলদ গম্ভীর, ব্যক্তিত্বও আছে খুব, লোকের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলেন।

আর্মি থেকে রিটায়ার করার পর প্রশান্ত বসু কিছুদিন আগ্রায় চেম্বার খুলে বসেছিলেন। কিন্তু বহু বছর প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেননি, শেষ বয়েসে আর ভাল লাগল না, পয়সাকড়িরও তেমন প্রয়োজন ছিল না, তাই স্ত্রীর অনুরোধে কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে থিতু হয়েছেন। কিন্তু একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার মানুষ তিনি নন, অনেকগুলি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এখন যুক্ত, সোনাগাছির যৌনকর্মীর ছেলেমেয়েদের চিকিৎসার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে তিনি খুব ব্যস্ত। সন্ধেবেলা গান বাজনার আসরে তিনি প্রায়ই উপস্থিত থাকেন না।

এই দম্পতির কোনও ছেলে নেই, দুটি মেয়ে। বড় মেয়ে স্বামীর সঙ্গে থাকে স্কটল্যান্ডে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ডাক্তার। ছোট মেয়ে এখনও বিয়ে করেনি, রিসার্চ করছে ব্যাঙ্গালোরে। সেও শিগগিরই বিদেশে কোথাও যাবে।

প্রথম মঙ্গলবারে সবসুদ্ধ পনেরো-ষোলো জন নারী-পুরুষ ছিল। সোফাগুলো সরিয়ে হলঘরের মেঝেতে পাতা হয়েছিল কার্পেট। সমস্ত ঘরটা ফুল দিয়ে সাজানো, একজন গায়ক আর একজন গায়িকা রবীন্দ্রসঙ্গীত আর অতুলপ্রসাদের গান শোনালেন। কেউ একটুও কথা বলে না। মাঝে মাঝে শুধু দু'একজন নিজেদের পছন্দমতন গানের জন্য অনুরোধ জানায়।

প্রথম প্রথম জহর খুব সঙ্কুচিত বোধ করছিল। যেন সে এখানে বেমানান। দু'চারটে পাড়ার জলসায় সে গেছে বটে, কিন্তু এরকম কোনও গান-বাজনার আসরে তো সে আগে কখনও আসেনি। গানের তেমন সমঝদারও নয় সে। টি ভি-তে যখন শুধু গান হয়, সে তখন উঠে অন্য কাজকর্ম সারতে যায়, সিরিয়াল দেখাতেই তার বেশি আগ্রহ।

খানিক বাদে অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল জহর। সে তো

রবাহুত হয়ে আসেনি। তাকে এখানে আসতে বলা হয়েছে। অন্যদের মতন সেও আমন্ত্রিত। তার কোনও হীনম্মন্যতাও নেই। বি এসসি পাশ করে সে একটা টেকনিশিয়ানের কাজ জুটিয়েছে, এই বাজারে তাই-ই বা ক'জন পায়। নৈহাটির এক প্রান্তে দু'কাঠা জমির ওপর আড়াই কামরার ছোট্ট বাড়ি, নিজেদের বাড়ি, তার বাবা রক্ত জল করা টাকায় বানিয়েছেন। বাড়ির বাইরে জহর সব সময় প্যান্টশার্ট আর মোজা সমেত জুতো পরে থাকে, এমন কিছু দামি পোশাক না হলেও ছেঁড়া কিংবা অপরিষ্কার তো নয়। কারখানার কাজের জন্য তার অন্য পোশাক রাখা আছে। জহরের চেহারা, সবাই তো বলে, বেশ ভালই।

ক্যাসেটে কিংবা টি ভি-তে গান শোনা, আর এত কাছে, সামনা সামনি কারুর মুখে গান শোনার তফাত অনেক। গায়িকাটির বয়েস বছর পঁয়তিরিশেকের বেশি না। তার নাম অনসূয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। মেরুন রঙের শাড়িতে খুব সেজেছে, উচ্চারণ একটু যেন আধোআধো, বিশেষ করে ল আর ত খুব নরম ভাবে বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। মাঝে মাঝে চোখ বুজে ফেলছে সে, যেন গান দিয়ে সে পুজো করছে কারুকে।

পরপর সাতটি গান গাইল তরুণীটি। জহর মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল, এরকম এক জায়গায় বসে চুপ করে গান শোনার অভিজ্ঞতা তার আগে হয়নি, সব রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মও সে বোঝে না। সে উপস্থিত নারী-পুরুষদের সাজ পোশাক লক্ষ করে তাদের সামাজিক অবস্থা বোঝবার চেষ্টা করছিল। এরা সবাই কলকাতায় থাকে। এদের মুখের ভাবে কিছু একটা তফাত বোঝা যায়।

গায়কটির বেলায় অন্যমনস্ক হবার সুযোগই নেই। গায়িকাটি যেমন শান্ত ও লাজুক ধরনের, গায়কটি ঠিক তার উল্টো, তার নাম রণবীর ঘোষাল, সে গাইতে গাইতে বারবার মাথা ঝাঁকায়, কখনও খুব জোরে হারমোনিয়াম বাজায়, আসর সরগরম করে তুলল একেবারে। অন্যদের অনুরোধ করতে হল না, সে গেয়ে গেল দশ এগারোটা গান একটানা।

গানের পর্ব শেষ হবার পর জুলি কাকিমা দুটি ভেলভেটের বাক্স উপহার দিলেন গায়ক ও গায়িকাকে। নিশ্চয়ই ভেতরে কোনও দামি জিনিস আছে, কিন্তু জুলি কাকিমা কিছু ঘোষণা করলেন না, খুলে দেখালেন না, একটু আড়াল করে তুলে দিলেন ওদের হাতে।

তারপর খাওয়া দাওয়া, সে অভিজ্ঞতাও জহরের কাছে নতুন।

বাড়িতে যে-রকম ভাত-ডাল-তরকারি রান্না হয়, তার সঙ্গে কোনও মিলই নেই। ভাতের মধ্যে এলাচের দানা মেশানো, ডাল খুব ঘন, তার

ওপর লাল করে ভাজা পেঁয়াজ ছড়ানো, ভেটকি মাছের ঝোলের রং একেবারে সাদা, কোনও মশলা ছাড়া রান্না নাকি? কিন্তু আঁশটে গন্ধ নেই। আলুর দমের আলুগুলো আস্ত মনে হলেও ভেতরে মাংসের কিমার পুর...।

খাওয়ার টেবিলের এক পাশে আর একটা ছোট টেবিলে মদ্যপানের ব্যবস্থাও ছিল। জহর কলেজ জীবনের শেষ দিকে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দু' একবার শিয়ালদার কাছে একটা বারে গিয়ে হুইস্কি-রাম খেয়েছে বটে, তারপর আর ও-সব ছোঁয়নি। চাকরির টাকায় সংসারের সব টানাটানিই মেটে না, ওসব বিলাসিতা তার সাজে না। কারখানার এক সহকর্মী বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একদিন রাম খাওয়াবার জন্য সেধেছিল, রাজি হয়নি জহর। তার সিগারেটের নেশা আছে, সেটাই সে চেষ্টা করে ছাড়তে পারছে না, তার ওপর আবার নতুন নেশা!

খাবারের টেবিলের কাছে গিয়ে জহর সবে মাত্র একটা প্লেট তুলে নিয়েছে, একজন তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, তুমি জহর না?

জহর মুখ ফিরিয়ে তাকাল। প্রায় তারই বয়েসী, ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন পুরুষ, থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে আধখানা লেন্সের শৌখিন চশমা।

জহর একেবারেই চিনতে পারল না।

লোকটি বলল, অনেকক্ষণ ধরেই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, ভুল করিনি তো? তোমার নাম জহর তো?

জহর আড়ষ্টভাবে মাথা নাড়ল।

লোকটি বলল, আমায় চিনতে পারছ না? অখিল, অখিল সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ কলেজে একসঙ্গে পড়েছি আমরা—

এবারে জহরের মুখ-স্বাভাবিক হয়ে এল। হ্যাঁ, ঠিকই তো, সেই অখিল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর ওই চশমার জন্য অনেকটা অন্যরকম দেখায়। অখিল সেনগুপ্ত ছাত্র ইউনিয়নের পাণ্ডাগোছের ছিল, খুব বক্তৃতা দিত। কলেজ ছাড়বার পর আরও একবার দেখা হয়েছিল ট্রেনে, দমদম থেকে উঠেছিল, সেও দশ-বারো বছর আগেকার কথা।

অখিল বলল, এখনই খাচ্ছ কী, পরে খাবে, পরে খাবে, আগে ওইদিকে চলো—

সে মদের টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল।

জহর বলল, আমি খাই না।

অখিল বলল, খাও না মানে? আমরা ইউনিয়ন দখল করার পর সেই যে সুজয়ের বাড়ির ছাদে বসে...মনে নেই?

তারপর ফিসফিস করে বলল, ভাল জিনিস আছে, প্রিমিয়াম স্কচ।

জহর অদূরে দাঁড়ানো জুলি কাকিমার দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে বলল, না ভাই, আমি খাব না।

অখিল তার হাত ধরে জোর করে টানতে টানতে জুলির সামনে গিয়ে বলল, বউদি, এই জহর আমার অনেক দিনের চেনা, কলেজের বন্ধু। তোমার সামনে ড্রিংক করতে লজ্জা পাচ্ছে।

জুলি মিষ্টি হেসে বললেন, আমার সামনে লজ্জা কী, আজকাল তো অনেকেই...তোমার কাকার তো রোজ একটু না হলে চলেই না।

প্রশান্ত বসু একটা গেলাশ ভর্তি বরফ মেশানো পানীয় নিয়ে গল্প করছিলেন গায়িকাটির সঙ্গে।

জহর বলল, আমার খাওয়ার অভ্যেস নেই।

অখিল বলল, আগে তো খেতে, এখন একটু নিয়ে দেখো।

জহর অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার জেদ বজায় রেখেছিল। সে মদ্যপান করেনি সেদিন।

জীবনযাপনে যে-সব স্মৃতির কোনও প্রয়োজন নেই, তা আস্তে আস্তে মুছে যায়। অখিল তার সহপাঠী ছিল বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না, তাই জহর ওর কথা আর মনে রাখেনি। নতুন করে পরিচয় হবার পর জহরের আবার অনেক কিছু মনে পড়ল। সেই সময় অখিল ছিল চালিয়াত ধরনের, পয়সাও খরচ করত খুব, আর মেয়েদের সম্পর্কে রসালো গল্প বলায় ছিল দারুণ ওস্তাদ, ওই বয়েসেই নাকি তার অনেক বান্ধবী ছিল, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের এক নামকরা সুন্দরী ছাত্রীর সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তাও ঠিকঠাক। কেউ কেউ অখিলকে জিজ্ঞেস করত, তুমিও প্রেসিডেন্সিতে না গিয়ে সুরেন্দ্রনাথে পড়তে এলে কেন? তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্ররা সুরেন্দ্রনাথ, সিটি, বিদ্যাসাগর কলেজ প্রসঙ্গে অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট উল্টে বলত, গোয়াল! অখিল বলেছিল, কী করব ভাই, আমার আপন কাকা সুরেন্দ্রনাথের ম্যানেজিং কমিটিতে আছেন, তাঁর জন্যই বাধ্য হয়ে—

আরও মনে আছে, একদিন সুজয়দের বাড়ির ছাদে মদ খেতে খেতে মাতাল হয়ে অখিল সুজয়ের নাকেই প্রচণ্ড ঘুঁষি কষিয়েছিল, একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড।

পরবর্তী জীবনে মানুষ অনেক বদলে যেতে পারে। ক্লাস-পালানো ছাত্রও পণ্ডিত হয়, বন্ধুদের সঙ্গে যে মারামারি করে, সেও হতে পারে হাইকোর্টের জজ। অখিলও বদলে গেল, প্রশান্ত বসুর বাড়ির আড্ডায় সে

বেশ জনপ্রিয়, প্রত্যেকেই তাকে চেনে, সে সাহিত্য-খেলা-রাজনীতি নিয়ে সমানে কথা বলতে পারে, গান বোঝে, গায়িকাটির পিঠে হাত দিয়ে কতক্ষণ হেসে হেসে গল্প করল!

কী সূত্রে অখিল জুলি কাকিমাকে বউদি বলে, তা জহর বুঝে উঠতে পারেনি, তবে জহর যে-ক'বার ওই ফ্ল্যাটে গেছে, প্রত্যেকবারই অখিলকে দেখেছে, ওই দম্পতির সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা বোঝা যায়, সে অনায়াসে ঢুকে যায় শয়নকক্ষে, কাজের মহিলাটিকে নাম ধরে ডাকে, জুলি কাকিমা বেশ পছন্দ করেন অখিলকে। মাঝে মাঝে ওঁদের কথা শুনে জানা যায়, গ্যাস ফুরিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় অখিল, ভি-সি-আর সারিয়ে আনে, বাজারে যে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না, তাও জোগাড় করতে পারে।

বাইরে থেকে এসে যাঁরা কলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন, তাঁদের কাছে এ রকম একজন উপকারী লোক পাওয়া ভাগ্যের কথা। সেই তুলনায় জহর কোনও কম্মের নয়। কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করা ছাড়া তার আর কোনও যোগ্যতা নেই। জুলি কাকিমা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভাল মাশরুম কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারো? জহর জীবনে কখনও মাশরুম কেনেইনি, সে ওসবের খবর জানবে কী করে?

তার জন্য অবশ্য জুলি কাকিমার ব্যবহারের কোনও হেরফের নেই। সব সময় মুখে মধুর হাসিটি লেগে থাকে।

প্রত্যেকদিন যে সন্ধের সময় ওই ফ্ল্যাটে অনেক লোকজন আসে তা নয়।

অফিস ছুটির পর উল্টোদিকের ট্রেনে চেপে জহর চলে আসে শিয়ালদায়। তারপর এক অপ্রতিরোধ্য টানে সে নৈহাটি লোকালকে উপেক্ষা করে চলে আসে থিয়েটার রোডে। কোনও কোনওদিন আরও দু' তিনজন থাকে। রণবীর এমনিই এসে গান শোনায়।

শ্রেয়া নামের একটি মেয়েও আসে প্রায়ই। মেয়েটির গায়ের রং কালো। সেটাই তার বৈশিষ্ট্য। আর সব দিক থেকে সে সুন্দর। এ দেশে সুন্দরের প্রথম মানদণ্ডই হল, কতখানি ফর্সা রং। কিন্তু কালো হলেও যে মানুষ কত আকর্ষণীয় হতে পারে, শ্রেয়াকে দেখলে বোঝা যায়, তার চোখ দুটি ঝকঝক করে। সে পড়াশুনোতেও খুব ভাল, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করছে, আবার সে অভিনয়ও করে একটি গ্রুপ থিয়েটারে। সে নাটকের গল্পও বলে, আবার বিজ্ঞানের গল্পও বলে। একদিন সে স্টিফেন হকিং নামে একজন অসাধারণ বিজ্ঞানীর কথা শোনাচ্ছিল, যিনি প্রায় হাত-পা নাড়তে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, সারা শরীরের মধ্যে

মাথাটাই সজাগ। তাঁর বইয়ের নাম, 'দা ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম'। সময় নিয়েই ইতিহাস, আবার সময়েরও ইতিহাস হয়?

জহর এ-সব কিছুই জানত না। বি এসসি পাশ করার পর বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। শ্রেয়ার কথা শুনে তার আফশোস হয়, কেন সে এম এসসি পড়ল না? বাবার তখনও চাকরি ছিল, কষ্টেসৃষ্টে কি আরও দু'বছর চালানো যেত না? তারপর যদি রিসার্চ করত, সে উঠে যেতে পারত সমাজের অন্য স্তরে। তখন এ-সব কিছু মনেই হয়নি, কোনও ক্রমে একটা চাকরি জোটানোই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

ও বাড়িতে জহর রাত আটটা-সাড়ে আটটার পর থাকে না। এরপর ট্রেন কমে যায়। নৈহাটি ফিরতে ফিরতে গভীর রাত। জহর উঠে আসার পরেও থেকে যায় কেউ কেউ। ডাক্তার প্রশান্ত বসু সমাজসেবার কাজ সেরে ফিরতে দেরি করেন প্রায়ই, যেদিন তিনি উপস্থিত থাকেন, শুধু সেদিনই পরিবেশন করা হয় মদ। অখিলই প্রধানত তাঁকে সঙ্গ দেয়। প্রশান্ত বসু দু'পেগের বেশি খান না, অখিলকেও একদিনও বেচাল হতে দেখেনি জহর।

রণবীরও আসে। খুব সম্ভবত মদ্যপানের আকর্ষণেই সে এখানে ঘন ঘন আসতে শুরু করেছে। সব মেয়েদের সঙ্গেই সে প্রেম প্রেম সুরে কথা বলে, এমনকী জুলি কাকিমার সঙ্গেও।

একদিন আটটা কুড়িতে জহর উঠে পড়ল। অন্যরা কলকাতায় থাকে, তারা আরও কিছুক্ষণ বসতে পারে। অখিল জমিয়ে একটা গল্প শুরু করেছে, তারই মধ্যে শ্রেয়া বলল, তাকেও তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, পরদিন ভোরে তাকে নাটকের দলের সঙ্গে যেতে হবে শিলিগুড়ি। অখিল বলল, আর একটু বসে যাও। তোমাকে আমি পৌঁছে দেব, শ্রেয়া রাজি হল না।

জহর আর শ্রেয়া একসঙ্গে নামল লিফ্‌টে।

রাস্তায় এসে শ্রেয়া জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন দিকে যাবেন?

জহর বলল, আমি তো যাব শিয়ালদায়, একটু হাঁটলেই বাস পেয়ে যাব।

শ্রেয়া বলল, আমি থাকি আমহার্স্ট স্ট্রিটে, একটা ট্যাক্সি ধরুন না, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

এই সময় ট্যাক্সি সহজেই পাওয়া যায়। ট্যাক্সিতে ওঠার পরই জহরের মনে হল, তারই কি উচিত শ্রেয়াকে আগে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে শেয়ালদায় ফিরে আসা? আমহার্স্ট স্ট্রিট এমন কিছু দূর নয়, ভাড়া দেবার মতন টাকাও তার কাছে আছে।

কিন্তু কথাটা সে বলতে পারল না। শ্রেয়ার মতন কোনও উচ্চশিক্ষিতা

মেয়ের সঙ্গে সে তো আগে কখনও একা এভাবে যায়নি। কোনটা ঠিক ভদ্রতা কে জানে!

থিয়েটার রোডের এই ফ্ল্যাটে যারা যারা আসে, তাদের কার সঙ্গে কোন সূত্রে এই বসু দম্পতির যোগাযোগ, তা জানার জন্য জহরের খুবই কৌতূহল। অথচ মুখে জিজ্ঞেস করা যায় না। অনেকেই মাসিমা ও মেসোমশাই বলে ডাকে, অরিন্দম আর বন্দনা নামে এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী ডাকে প্রশান্তদা আর জুলিদি! দাদার স্ত্রী কী করে দিদি হয়, তা জহর বোঝে না। প্রশান্ত-জুলিও আপত্তি করেন না। অরিন্দম আর বন্দনা বহুদিন বিদেশে ছিল, দেশে ফিরেছে বটে পাকাপাকি, কিন্তু মনটা বিদেশেই রয়ে গেছে কথায় কথায় বলে, আমরা যখন জার্মানিতে ছিলাম!

শ্রেয়ার বয়েসই সবচেয়ে কম, সেও জহরের মতন ওঁদের কাকা-কাকিমা বলে। তা হলে কি শ্রেয়া তার আত্মীয়? বাবার কোনও আত্মীয়স্বজনের অবস্থাই তেমন সচ্ছল নয়, সবাই নিম্ন মধ্যবিত্ত, শিক্ষাদীক্ষাতেও সবাই সাধারণ, একমাত্র প্রশান্ত বসুর মা আর জহরের ঠাকুমা দুই আপন বোন হলেও একজনের দৈবাৎ বিয়ে হয়েছিল ধনী পরিবারে। বাবার বাবাও যেমন ছিলেন স্কুল মাস্টার, প্রশান্ত বসুর বাবাও তেমনই ছিলেন ডাক্তার। গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। ওঁরা আগে থেকেই অবস্থাপন্ন, ডাক্তারিতে সার্থক হয়ে ধনী হয়েছিলেন আরও।

তা হলে শ্রেয়ার সঙ্গে কী ধরনের আত্মীয়তা হতে পারে?

প্রথমে কিছুক্ষণ শ্রেয়া কোনও কথা বলল না। তারপর হ্যান্ডব্যাগ খুলে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরিয়ে বলল, কাকা-কাকিমার সামনে খাই না, এক এক সময় খুব ইচ্ছে করে যদিও—

জহরের চেনাশুনো একটি মেয়েও সিগারেট খায় না। তবে টি ভি সিরিয়ালের কোনও কোনও মেয়ে সিগারেট টানে, সেটা দেখা তার অভ্যেস আছে। তার খারাপ লাগে না। বিয়ের পর, রাত্রে বিছানায় শুয়ে শেষ সিগারেটটা ফোঁকার সময় সে আদর করে কয়েকবার শান্তার ঠোঁটেও সিগারেট গুঁজে দিয়েছে, একটু টানলেই শান্তা কাশতে শুরু করত। এখন শান্তা সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারে না, তাই বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানা বন্ধ, শেষ সিগারেটটা জহর বারান্দায় গিয়ে ধরায়।

জহর বলল, আমিও কাকা-কাকিমার সামনে সিগারেট ধরাতে পারি না, অখিল যদিও দিব্যি খায়, ওঁরা হয়তো কিছু মনেও করবেন না, তবু আমার লজ্জা লাগে।

শ্রেয়া বলল, ছেলেরা তবু পারে, মেয়েদের বেলায় অন্যরকম। আপনাকে ওঁরা ছোটবেলা থেকে দেখছেন, তাই আপনি লজ্জা পাচ্ছেন, একদিন ফস করে পারমিশান চেয়ে নেবেন।

জহর বলল, না, আমাকে ওঁরা ছোটবেলায় দেখেননি। প্রশান্ত কাকা যদিও আমার বাবার মাসতুতো ভাই হন, কিন্তু ওঁরা তো বহুদিন বাংলার বাইরে। তাই আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই ছিল না, আমিও ওঁদের আগে দেখিনি, এই তো মাত্র তিন মাস আগে।

শ্রেয়া বলল, ও, তাই বুঝি?

জহর জিজ্ঞেস করল, আপনি... যখন ওঁরা নর্থ ইন্ডিয়ায় থাকতেন, তখনও দেখেছেন?

শ্রেয়া হেসে ফেলে বলল, তখন দেখব কী করে! চিনতামই না। গত বছর নভেম্বরে ব্যাঙ্গালোর গিয়েছিলাম রিসার্চের কাজে, সেখানেই তো ওঁদের মেয়ে নয়নার সঙ্গে আলাপ হল। তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই খুব ভাব হয়ে গেল, বুঝলেন। নয়না দারুণ মেয়ে। আমরা দু'জনেই একসঙ্গে ট্রেনে ফিরলাম ব্যাঙ্গালোর থেকে। তারপরেই ওর মা-বাবাকে প্রথম দেখি। জুলি কাকিমাকে আমার এত ভাল লাগে। তাই তো এখানে প্রায়ই আসতে ইচ্ছে করে। আমার তো মা নেই—

শ্রেয়ার সঙ্গে যে লতায়পাতায়ও কোনও আত্মীয়তা নেই, এটা জেনে কেন যেন বেশ আনন্দই হল জহরের।

কারও মা নেই শুনলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতে হয়। জহরেরও অবশ্য মা নেই, সে কথা এক্ষুনি জানাবার কোনও মানে হয় না।

শ্রেয়াই অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলল, আপনি আমাদের কোনও নাটক দেখেছেন?

জহরকে স্বীকার করতেই হল, সে দেখেনি। কলকাতায় এসে সন্ধেবেলা নাটক দেখার অভ্যেস নেই তার। সে পুরোপুরি মফস্বলের মানুষ। শ্রেয়াদের নাটকের দলটির অস্তিত্বের কথাই তার জানা ছিল না।

শ্রেয়া বলল, কাল শিলিগুড়িতে একটা কল-শোতে যাচ্ছি। আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার অ্যাকাডেমিতে আর একটা শো আছে, সেদিন আসতে পারেন।

জহর বলল, আচ্ছা আসব, নিশ্চয়ই আসব।

শ্রেয়া বলল, টিকিট কাটতে হবে কিন্তু আমরা কাউকে ফ্রি টিকিট দিই না।

জহর বলল, আশা করি কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশি হবে না। আপনি এত

সময় পান কী করে? এদিকে রিসার্চ করছেন, সেই সঙ্গে নাটক, বাইরেও যেতে হয়—

শ্রেয়া বলল, এই কথাটা অনেকেই জিজ্ঞেস করে কেন বলুন তো? কাজ করতে চাইলে কি মানুষের সময়ের অভাব হয়? আমার নাটকে অভিনয় করতে ভাল লাগে, আমরা সত্যিকারের ভাল নাটক, সিরিয়াস নাটক করি। কাজের ব্যাপারে আমি কোনও রুটিন মানি না। যেদিন পড়াশুনোয় খুব মন লেগে যায়, রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত, এমনকী সারা রাত লেখাপড়া করি। পরের দিন বেলা এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিই, বাস! আবার এক একদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে পড়ি। যখন একটানা রিহার্সাল থাকে, সাধারণত সন্ধেবেলা হয়, তখন সারা সকাল-দুপুর লেখাপড়ার কাজ সেরে নিই।

নতুন, নতুন, এইসব কথাই জহরের কাছে একেবারে নতুন। সারা রাত জেগে পড়াশুনো করে। এরকম কোনও মেয়েকে জহর কখনও দেখেনি।

শ্রেয়া বলল, অনেক মানুষের জীবনই একমুখী হয়, এটা আমার সহ্য হয় না। যে লেখাপড়া করবে, সে নাটক করবে না, কিংবা গান গাইবে না, কিংবা আড্ডা দেবে না, এর কি কোনও মানে আছে? আর যারা নাটক করে কিংবা গান গায়। তারাই বা পড়াশুনো করবে না কেন? আমাদের দলের ছেলেমেয়েদের আমি মাঝে মাঝে পড়া ধরি, জানেন তো! সব্বাইকে বলি, কিছু কিছু বিজ্ঞান পড়তেই হবে, ফিজিক্স কী কাণ্ড ঘটাচ্ছে, বলুন! আগামী সেঞ্চুরিতে ফিজিক্স যে মানুষের সভ্যতাকে কোথায় নিয়ে যাবে—

শিয়ালদা এসে গেছে, শ্রেয়া ট্যাক্সি ড্রাইভারকে থামতে বলল।

এবার জহর বলল, চলুন, আপনাকে আমহার্স্ট স্ট্রিট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

শ্রেয়া একটু অবাক হয়ে বলল, আপনি আমহার্স্ট স্ট্রিট পর্যন্ত যাবেন? কেন?

জহর বলল, আপনার কথা শুনতে বেশ ভাল লাগছে।

শ্রেয়া এবার মুচকি হেসে বলল, তা তো ভাল লাগবেই। আমি ভাল কথা বলতে পারি। আমার কথা আবার পরে শুনবেন। এখন নেমে পড়ুন, ট্রেন ছেড়ে দেবে।

এর পরেও জোর করার মতন মনের জোর জহরের নেই। সে নেমে দাঁড়াল। দু'জনে এলে কি আদ্ধেকটা ভাড়া দিয়ে দিতে হয়? সে পকেটে হাত ঢোকাতেই শ্রেয়া ড্রাইভারকে বলল, আপনি চলুন!

নৈহাটির ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, বসবার জায়গা নেই অবশ্য, সব কামরাই ঠাসা। জহর একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

দাঁড়িয়েই তো যেতে হবে, ছাড়ার সময় উঠবে।

বছরের পর বছর এরকমভাবে ট্রেনে ফিরেছে। কিন্তু আজ সে যেন অন্য মানুষ। একটি অনাত্মীয় যুবতী মেয়ের সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে আসা, এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রথম। শ্রেয়ার কী সহজ, স্বাভাবিক ব্যবহার, একটুও আড়ষ্টতা নেই, ন্যাকামি নেই। জহরের তুলনায় যে মেয়েটি অনেক বেশি গুণী, তা জহর স্বীকার করতে বাধ্য, অথচ সেজন্য তো একটুও তাচ্ছিল্যের ভাব নেই জহরের প্রতি।

ট্রেন ছাড়ার পর ঠেলাঠেলি করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জহর কামরার অন্য লোকদের দিকে চোখ বুলোল। প্রায় সবাই তার মতন নিম্ন মধ্যবিত্ত, কয়েকজন বড় জোর খানিকটা উঁচু। যারা বসবার জায়গা পেয়েছে, তারা এরই মধ্যে ঝিমোতে শুরু করেছে, অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ঝিমোয়। এক কোণে গোটা পাঁচেক ছেলে জোরে জোরে রাজনীতি নিয়ে তর্ক শুরু করেছে। প্রত্যেকদিন প্রায় একই দৃশ্য। এরা কেউ কি শ্রেয়ার মতন কোনও মেয়েকে দেখেছে? থিয়েটার রোডে ডাক্তার প্রশান্ত বসুর ফ্ল্যাটের পরিবেশটা জানে? জহর এদের সকলের চেয়ে আলাদা হয়ে গেছে।

মাঝখানে থেমে থেমে ট্রেনটা নৈহাটি পৌঁছতে পৌনে বারোটা বাজিয়ে দিল। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে, রিকশা নেই, থাকলেও যাচ্ছেতাই ভাড়া চাইত।

জহর হাঁটতে শুরু করল।

নিথর, নিষ্প্রাণ মফস্বল। কিছু বদলোক ছাড়া এই অন্ধকারে আর কেউ রাস্তায় থাকে না। মাঝে মাঝে খুনোখুনি হয়। কিন্তু জহরের মতন নিরীহ লোকদের গুণ্ডারাও ছোঁওয়ার যোগ্য মনে করে না। একদিন এই রকম রাতেই ভূতের মতন তিনটে লোক গলি থেকে ছুটে এসে ঘিরে ধরেছিল তাকে। একজন হাত চেপে ধরল, আর এক জনের হাতে ছোরা থাকলেও জহরের মুখটা দেখেই বলল, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ফালতু!

আজকাল আর ছিনতাইয়ের সুখ নেই। হাত ঘড়ি এত শস্তা হয়েছে, তিরিশ-চল্লিশ টাকাতেও পাওয়া যায়, ডট পেন তিন টাকা, যাদের ট্রেনের মান্থলি আছে, তারা পকেটে দশ-কুড়ি টাকার বেশি রাখে না। সেইদিনের পর থেকে আর জহর ভয় পায় না একটুও।

বুড়ো বয়েসে মানুষের ঘুম কমে যায়। জহরের ফিরতে যত রাতই হোক, দীনেশ জেগে থাকবেনই। সারাদিন কোথায় কী হল শুনতে চান, জহরের তখন আর কথা বলার ধৈর্য থাকে না, জহর সংক্ষেপে হুঁ-হাঁ করে যায়। শান্তা ঘুমিয়ে পড়লেও শব্দ পেয়ে জেগে ওঠে, খাবার গরম করতে

বসে। জহর অনেকবার আপত্তি জানিয়েছে, অত আদিখ্যেতার দরকার কী, ঠাণ্ডা রুটি-তরকারি খেতে তার কোনও অসুবিধে নেই, শান্তা শুনবে না।

খাটটা তেমন বড় নয়, দুটি ছেলে-মেয়ে জন্মানোর পর সবাইকে এক খাটে ধরে না। এখন শান্তা তার সন্তানদের নিয়ে খাটে শোয়, জহরের জন্য বিছানা পাতা হয় মেঝেতে। কোনও কোনও রাতে আলো নেভাবার পর শান্তা খাট থেকে নেমে এসে জহরের পাশে জায়গা করে নেয়। জহরের যখন সাড়ে পাঁচ বছর বয়েস, তখন সে একদিন মাঝরাতে জেগে উঠে তার বাবা-মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছিল। সেই দৃশ্যটা সে জীবনে ভোলেনি।

বাড়িতে ঢুকলেই কেমন যেন একটা আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়। কিংবা ঠিক আঁশটে নয়, ভ্যাপসা মতন, অথচ রোদ্দুর তো ভালই ঢোকে। থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে তো এরকম কোনও গন্ধ নেই। ওরা তো আতর-সুবাসও ছড়ায় না। তবু এরকম তফাত হয় কেন?

আজ আবার শখ করে এত রাতে বেগুন ভাজতে বসেছে শান্তা। রান্নাঘরের বাইরেই বারান্দায় পিঁড়ি পেতে খেতে বসেছে জহর, রুটি ছিঁড়ে ঝিঙের তরকারি দিয়ে খেতে খেতে শান্তার দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ খেয়াল করল, বেশ রোগা হয়ে গেছে তার বউটা। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে, খানিকটা যেন চুপসে গেছে স্তনদুটি। দুটি ছেলেমেয়ের জন্মের ব্যবধান মাত্র এক বছর দু মাস, ওই দুটিকে সামলাতে সামলাতে শান্তা সারাদিন নাজেহাল, তার ওপর আছে শ্বশুরের বায়নাক্কা, শান্তার নিজস্ব কোনও আমোদ-আহ্লাদ নেই, টি ভি দেখারও সময় পায় না।

জহর ঠিক করল, একদিন সে শান্তাকে থিয়েটার রোডের বাড়িতে নিয়ে যাবে, জুলি কাকিমা, শ্রেয়াদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। শান্তা ওদের মতন সাজতে-গুজতে জানে না। মুখ ফুটে কথা বলতে পারবে না। তাতে কী, তার বউ যেমন, তেমনই লোকে দেখুক, তাতে জহরের লজ্জা নেই, শান্তাকে সে ওইরকম একটা আনন্দময় পরিবেশের ভাগ দেবে না কেন?

তিন

জুলি কাকিমা কখনও ট্রামে-বাসে চাপেননি, একা ট্যাক্সিতে কোথাও ঘোরার অভ্যেসও তাঁর নেই। গাড়ি ও ড্রাইভার আছে বটে, কিন্তু তাঁর স্বামী প্রায় দিনই সকালে গাড়ি নিয়ে যান, ফিরতে ফিরতে বিকেল, কোনও কোনও দিন দুপুরে একবার ফিরেই বেরিয়ে যান আবার। সোনাগাছি ও সি আই টি রোডের দুটো ক্লিনিক চালাচ্ছেন, তাই তিনি খুব ব্যস্ত। জুলি

কাকিমার এখানে সেখানে যাবার দরকার হলে অখিল তাকে সঙ্গ দেয়। অখিল অনেক কিছুর সন্ধান রাখে, নিউ মার্কেট কিংবা দক্ষিণাপণের অনেক দোকান তার চেনা।

অখিলের সুবিধে, তাকে নির্দিষ্ট সময়ের চাকরি করতে হয় না, তার অর্ডার সাপ্লাইয়ের নিজস্ব ব্যবসা। মাঝে মাঝে তাকে দু'চারদিনের জন্য দুর্গাপুর, আসানসোলেও যেতে হয়, অর্ডার ধরার জন্য।

একদিন সে জহরকে বলল, তুই একবার বউদিকে নর্থ ক্যালকাটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনতে পারবি? বউদি খুব ছোটবেলায় দেখেছিলেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, পরেশনাথের মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দর বাড়ি, আমি নর্থ ক্যালকাটা ভাল চিনি না।

জহর বলল, হাটখোলাও তো নর্থ ক্যালকাটায়, সেখানকার দত্তদের বাড়িতে জুলি কাকিমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?

অখিল বলল, আরে হাটখোলার দত্ত বাড়ির লোকরা কি আর এখন হাটখোলায় থাকে? সারা কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে। অনেকে বিলেতে-আমেরিকায়। উনি কারুর বাড়িতে যেতে চান না, শুধু ঘুরে দেখে আসতে চান।

জহর একটু মুশকিলে পড়ে গেল।

কোনও রবিবারই সে নৈহাটির বাড়ি থেকে বেরুতে চায় না। বাড়িরও তো কিছু কাজকর্ম থাকে। ছেলে-মেয়েদুটির সঙ্গে সময় কাটাবার জন্যও ওই একটা দিন বরাদ্দ। আর অন্য দিন যেতে হলে অফিস থেকে ছুটি নিতে হয়। তার অফিসে কিছুদিন ধরে একটা গণ্ডগোল চলছে। ইউনিয়নের নেতারা বেশি বাড়াবাড়ি করছে, মালিকরা হঠাৎ লক আউট ঘোষণা করে দিতে পারে। এই বাজারে চাকরি গেলে মহা বিপদ। অবশ্য ইউনিয়নের একজন নেতা জহরকে আশ্বাস দিয়েছেন, সে রকম অবস্থা পর্যন্ত তারা যাবে না। পর পর অনেক কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা সেয়ানা হয়ে গেছে। তা বলে কি মালিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে না? নরমে গরমে রাখতে হবে। কাজের সময় গণ্ডগোল না করে শুধু দুপুরে টিফিনের সময় স্লোগান, তখন কিন্তু ইউনিয়নের সব মেম্বারদের উপস্থিত থাকা চাই-ই।

সে যাই হোক, জুলি কাকিমা বেড়াতে যেতে চেয়েছেন, সে জন্য জহর সব কিছু তুচ্ছ করতে পারে। একদিন টিফিনের সময় দু'চারটে স্লোগান দিয়েই পরের হাফ-ডে ছুটি নিয়ে নেবে।

কলেজে পড়ার সময় জহর নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে এক পিসেমশাইয়ের

বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে এক বছর ছিল, সেই সময়ই উত্তর কলকাতা তার যতটুকু চেনা।

অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হলে ট্যাক্সির বদলে একটা গাড়ি ভাড়া করাই ভাল। সে তো চাইলেই পাওয়া যায়। জুলি কাকিমা তৈরিই ছিলেন, জহর ঠিক দুটোর সময় তাঁকে তুলে নিল।

চওড়া লাল পাড় সিল্কের শাড়ি পরেছেন আজ, তাঁকে দেবী প্রতিমার মতন দেখাচ্ছে। যদিও ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল, উনি কক্ষনও সিঁদুর পরেন না, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, হাত কাটা ব্লাউজ। দেবীমূর্তিদের চুল কাটা থাকে না, কোমর পর্যন্ত চুল, পাড়ার প্যান্ডেলের দুর্গাঠাকুরের ঠোঁটে লিপস্টিকের মতন রং অবশ্য থাকে। ব্লাউজ হাতকাটা কিংবা ব্লাউজ একেবারেই থাকে কি না, তা জহর ঠিক মনে করতে পারল না। দুর্গাঠাকুর যদি জ্যান্ত হতেন, তার গলার আওয়াজ কেমন হত সে সম্পর্কে জহরের ধারণা নেই, জুলি কাকিমার মতন এমন মিষ্টি হত না? সরস্বতীর হলেও হতে পারে, কিন্তু দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গেই জুলি কাকিমার মিল বেশি।

জুলি কাকিমার বয়েস পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন তো হবেই, কিন্তু কেউ বলে না দিলে তাঁকে চল্লিশেরও কম মনে হতে পারে। তিনি বয়েস লুকোবার চেষ্টা করেন না, যৌবন ধরে রেখেছেন। সেই জন্য প্রথম দেখে জহরের মনে হয়েছিল ইনি বোধহয় প্রশান্ত কাকার মেয়ে কিংবা পুত্রবধূ। বাইরে বেরুবার সময় একটু সাজগোজ করা এঁদের অভ্যেস, কিন্তু সেই সাজে উগ্রতা নেই। কানে দুটি ছোট্ট দুল ছাড়া কোনও গয়নাও পরেন না।

জুলি কাকিমা বয়েস লুকোন না, বরং বাড়িয়ে বলেন। কখনও বয়েসের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি বলেন, আর কী, এই তো ষাট বছর হয়ে এল।

এ রকম ছোট করে চুল ছাঁটা কোনও মহিলাকে জহর এত কাছ থেকেও কখনও দেখেনি। মেয়েদের ঘাড়েরও যে একটা সৌন্দর্য আছে, তা সে জানতই না। উন্নত ঘাড়, নরম, তকতকে, ময়লা নেই এক ছিটে। সারা শরীরে চাপা সুগন্ধ।

প্রথমেই যাওয়া হল জোড়াসাঁকো। রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে জন্মেছিলেন, সেই ঘরে যাবার জন্য লম্বা লাইন পড়েছে। ওরা দু'জনে দাঁড়াল সেই লাইনে। আজ সাংঘাতিক গরম পড়েছে বটে!

জুলি বললেন, আমার যখন ন' বছর বয়েস, তখন এ বাড়িতে একবার এসেছিলাম। তারপর তো বাবা এলাহাবাদ চলে গেলেন আমাদের নিয়ে, কত বছর আর এদিকে আসা হয়নি। অনেক কিছু বদলে গেছে। এ জায়গাটা অন্য রকম ছিল। এই মাঝখানের বাড়িটা যেন তখন আরও বড়

মনে হত।

জহর জিজ্ঞেস করল, আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছেন?

জুলি ভুরু তুলে বললেন, ওমা, সে ভাগ্য করে কি জন্মেছি? কেন যে আর আড়াই বছর আগে জন্মালাম না!

বলেই উনি হাসলেন। জন্মালেই কি ওঁকে দেখতে পেতাম? তখন দেখলেও কি কিছু মনে থাকত?

লাইন এগোচ্ছে খুব আস্তে আস্তে। এরই মধ্যে ঘেমে গেছেন জুলি, মুখে বিন্দু ঘামের ফোঁটা। জহরের মনে হল, জুলি কাকিমাকে এ ভাবে লাইনে দাঁড়ানো মানায় না। উনি তো অন্যদের মতন নন, অনেকেই ঘুরে ঘুরে ওঁর দিকে তাকাচ্ছে। এখানে যদি কোনও মন্ত্রীর বউ আসত, তাকে কি লাইনে দাঁড়াতে হত?

জহর বলল, কাকিমা, আপনার খুব রোদ লাগছে, চলুন ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াই, এই লাইনে অনেক সময় লাগবে।

জুলি বললেন, সেই ভাল, রোদটা বড় বেশি। বরং চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখি।

লাইন থেকে বেরিয়ে ছায়ার দিকে যেতে যেতে জহর বলল, এখানে যদি অখিল থাকত, ও ঠিক ম্যানেজ করে আপনাকে আগে আগে ঢুকিয়ে দিত। আমি আবার ও-সব পারি না।

জুলি বলল, হ্যাঁ, ও যে কী সব কাণ্ড করে! একদিন নন্দনে সিনেমা দেখতে গেছি, টিকিট নেই, অখিল ভেতরে গিয়ে কাকে কী বলে টলে আমাকে ওপরে নিয়ে বসিয়ে দিল। আমার খুব লজ্জা করছিল। ওভাবে যেতে আমার ভাল লাগে না।

জহর ঠিক এই রকম উত্তরই আশা করেছিল। তার ব্যর্থতাবোধের মধ্যেও একটা চাপা আনন্দ খেলে গেল।

জুলি বললেন, আমার এক মামারা ব্রাহ্ম ছিলেন। সে বাড়িতে প্রতি মাসে প্রার্থনা সভা হত, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা আর গান। শুনে শুনেই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষ কবিতা, 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/ বিচিত্র ছলনাজালে/ হে ছলনাময়ী...' এটা শুনলেই কান্না পেত আমার। তুমি পড়েছ নিশ্চয়ই?

শুনেই জহরের আফশোস হল, কেন যে পড়েনি!

তবে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতেও তার লজ্জা নেই। মুখ নিচু করে বলল, না পড়িনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা স্কুলে পড়েছি, তাও সব মনে

নেই, তারপর তো আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম।

জুলি মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, বিজ্ঞান পড়লে বুঝি কবিতা পড়তে নেই? জগদীশ বোস কত বড় সায়েনটিস্ট ছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা দারুণ ভালবাসতেন। আমার মামাও করপোরেশানের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন—

জহর বলল, আসলে আমি কিছুই পড়াশুনো করিনি। কেন যে করিনি, জানি না। কোনওরকমে পরীক্ষা পাশ করে একটা চাকরি জোটানোর কথাই ভেবেছি। এখন কি আর শুরু করা যায়?

জুলি বললেন, কেন যাবে না। তোমাকে আমি একটা সঞ্চয়িতা প্রেজেন্ট করব। তোমার তো দুটি ছেলেমেয়ে, তাদেরও পড়াবে! তোমার ছেলেমেয়েদের দেখিনি, নিয়ে এসো একদিন। তোমার বউকেও এনো, একটা ছুটির দিন, সারা দিন আমাদের ওখানে থাকবে—

জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতী পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ওরা অনেকেই প্রেমিক-প্রেমিকা, আড়চোখে দেখছে এদের দু' জনকে। হয়তো এ দু' জনকেও অনেকে প্রেমিক-প্রেমিকা ভাবছে!

লাইনটা আরও বাড়ছে দেখে জুলি বললেন, আজ আর রবীন্দ্রনাথের ঘরটা দেখা হবে না। আর একদিন সকাল সকাল আসব। এবার চলো, পরেশনাথের মন্দির দেখে আসি। আমার মনে আছে, পরেশনাথের মন্দিরে একটা পুকুরে অনেক মাছ ছিল, ছোলা ছুড়ে ছুড়ে দিলে মাছগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে খেত, বাবাঃ, একসঙ্গে অত মাছ আমি আর কোথাও দেখিনি।

পরেশনাথের মন্দির দুটো আছে। একটা বেলগাছিয়া ব্রিজের কাছে, আর একটা সার্কুলার রোডে। এর মধ্যে কোনটা?

একটু চিন্তা করে জুলি বললেন, যত দূর মনে পড়ছে, ব্রিজের ধারে তো নয়, বড় রাস্তার ওপরেও নয়।

গাড়ির ড্রাইভার চেনে, সে সার্কুলার রোডে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাশ দিয়ে নিয়ে গেল পুরনো পরেশনাথের মন্দিরে।

এই একটু আগে গনগনে রোদ ছিল। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

জহরের বৃষ্টি ভেজা অভ্যেস আছে। এই বর্ষাকালে ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়ই তাকে ভিজতে হয়, শরীর তা সহ্য করতে পারে। কিন্তু জুলিও বৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ না করে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে।

জহর জিজ্ঞেস করল, আপনি ভিজবেন? গাড়িতেই বসে থাকলে হত না?

জুলি বললেন, না, না, একটু ভিজলে কী আর হবে? বড় জোর একটু

জ্বর হবে!

জহর বলল, শুধু শুধু জ্বর বাধাবেন কেন?

জুলি হেসে বললেন, অনেকদিন আমার জ্বর হয়নি। তেমন কোনও অসুখ-বিসুখই হয়নি। এবার একটু অসুখ হলে মন্দ হয় না। তা হলে তোমাদের প্রশান্ত কাকা নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা করার একটু সুযোগ পাবেন। একটু বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকবেন।

অন্য লোকেরা বৃষ্টি এড়ানোর জন্য বড় গেটটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু জহর আর জুলি ভিজতে ভিজতে মন্দিরটা দেখতে গেলেন। তারপর পুকুরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে জুলি বললেন, মজার ব্যাপার, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেই কতকাল আগে এখানে যখন প্রথম আসি, সেদিনও খুব বৃষ্টি পড়েছিল। আমি আর আমার ছোট বোন খুব দৌড়োদৌড়ি করেছিলাম। আমার কিছু হয়নি। আমার ছোট বোন লিলিরই জ্বর হয়েছিল।

পুকুরটিতে মাছ আছে বটে, কিন্তু জল তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। রক্ষণাবেক্ষণে যত্নের অভাব। জুলি স্মৃতিমেদুর চোখে আগের সঙ্গে তুলনা করে মিলিয়ে নিচ্ছেন।

এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ছেলে-মেয়েরা এই মন্দির দেখেছে?

জহর বলল, না।

জুলি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কেন, ওদের কলকাতায় আনো না মাঝে মাঝে?

জহর বলল, খুব একটা আনা হয় না। একবার-দু'বার এসেছে।

জহর মনে মনে বলল, শুধু পরেশনাথের মন্দির কেন, ওরা তো জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িও দেখেনি। শান্তাও দেখেনি।

জুলি বললেন, আমার বাবা, আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমাদের ভাই-বোনদের প্রত্যেক রবিবার কোথাও না কোথাও নিয়ে যেতেন, এইসব জায়গা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল...মনে আছে, একবার ইডেন গার্ডেনে বিরাট করে একটা ন্যাশনাল ফেয়ার হয়েছিল। জলের ওপর একটা রেস্তোঁরা হয়েছিল, সেটা আবার ঘুরত, আমাদের কাছে সেটাই ছিল দারুণ অ্যাট্রাকটিভ ব্যাপার...

শুনতে শুনতে জহর মনে মনে বলল, আমার বাবা অল্প বয়েসে আমাকে ও বোনেদের তো এই সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাননি! তার নিজেরও বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে প্রতি রোববার বেড়াবার কথা মনেও পড়ে না। এ-সব আপার ক্লাসের লোকদের ব্যাপার! যদিও এ-সব জায়গায় ঢুকতে তো

পয়সা লাগে না। জহর নিজেই তো পরেশনাথের মন্দির এই প্রথম দেখল!

বৃষ্টিতে একেবারে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছেন জুলি। এ রকম ভেজা পোশাক নিয়ে আর বেড়াবার প্রশ্ন ওঠে না,. বাড়ি ফেরাই উচিত। জুলির কিন্তু উৎসাহ কমেনি। গাড়িতে উঠে বললেন, আমাদের শ্রেয়া এই দিকেই কোথাও থাকে না? অনেকবার সে তার বাড়িতে যেতে বলেছে। এখন ঘুরে গেলে কেমন হয়?

জহর বলল, আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকে শুনেছি, নম্বর তো জানি না।

জুলি বললেন, সে আবার এই সময় বাড়ি থাকবে কি না, তারও তো ঠিক নেই। সে কত কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। দাঁড়াও দেখি সে কোথায়।

হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা মোবাইল ফোন বার করে তিনি নম্বর টিপলেন।

ওদিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল। হ্যাঁ, শ্রেয়া বাড়িতেই আছে, সে এক্ষুনি চলে আসতে বলছে।

সিটি কলেজের কাছেই বাদুড়বাগানে শ্রেয়াদের বাড়ি।

একতলায় কতকগুলি দোকান ঘর, দোতলায় শুধু শ্রেয়া আর তার ছোট বোন থাকে, আর কেউ না। এটা ওদের পৈতৃক বাড়ি, কিন্তু শ্রেয়ার বাবা থাকেন জয়পুরে। ছোট বোনটি ডাক্তারি পড়ছে, সে এখন বাড়ি নেই, শ্রেয়া পড়াশুনো করছিল অনির্বাণ নামে তার এক সহপাঠীর সঙ্গে। বসবার ঘরে খাতাপত্র ছড়ানো।

জহরের অভিজ্ঞতার জগতে কোনও অবিবাহিতা যুবতী মেয়ে এ রকম নির্জন দুপুরে একজন যুবকের সঙ্গে এক ঘরে থাকে না। থাকলেও সেটা গোপন, অবৈধ ব্যাপার। টেলিফোন পাবার পরেও তো শ্রেয়া অনির্বাণকে চলে যেতে বলেনি। বরং খুব সহজভাবে তার এই বন্ধুর সঙ্গে জুলি ও জহরের আলাপ করিয়ে দিল। জুলি কাকিমাও একটুও অবাক হলেন না।

আর একটা ব্যাপার শুধু বিস্ময়ের নয়, মজারও বটে!

ওদের দেখে শ্রেয়া হইহই করে অভ্যর্থনা জানাল, এদের দু' জনেরই জামাকাপড় ভেজা দেখে প্রশ্ন শুরু করল। জুলি বলল, আমার শাড়িটা বড্ড ভিজে গেছে। তোর একটা শাড়ি দে তো শ্রেয়া, আমারটা বদলে ফেলি!

শ্রেয়া লজ্জায় জিভ কেটে বলল, এমা, কী হবে!

বাড়িতে একটাও শাড়ি নেই! দু' বোনই শালোয়ার-কামিজ আর জিন্‌স টি শার্ট পরে। ছোট বোনটা তো একেবারেই শাড়ি পরতে চায় না, শ্রেয়া বিয়ে বাড়ি-টাড়ি শাড়ি পরে যায় কখনও-সখনও, সেই দু'খানি শাড়িই ডাইং ক্লিনিং-এ কাচতে দিয়েছে।

শ্রেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুলিরও হেসে গড়াগড়ি দেবার মতন অবস্থা। শ্রেয়া জুলিকে শালোয়ার-কামিজ পরাবেই, জুলি কিছুতেই পরবেন না। এতকাল প্রবাসে কাটালেও তিনি শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু কখনও পরেননি, শুধু বাড়ির মধ্যে নাইটি, হাউজ কোট। তা ছাড়া শ্রেয়ার শালোয়ার-কামিজ তাঁকে ফিট করবে কেন? শ্রেয়ার তুলনায় তাঁর শরীর ভারী।

জহরকে শ্রেয়া বলল, আপনাকেও তো প্যান্ট শার্ট দিতে পারব না। আপনি বাথরুমে গিয়ে তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছে ফেলুন, আর শার্টটা খুলে পাখার তলায় রাখুন, শুকিয়ে যাবে।

জহর কিছুতেই শার্ট খুলতে রাজি নয়।

শ্রেয়া বলল, আমাদের সামনে খালি গায়ে থাকতে লজ্জা পাচ্ছেন, অত কিছু ফর্মালিটি করতে হবে না।

নিজের বাড়িতে জহর লুঙ্গি পরে খালি গায়েই থাকে, এখানে সে লজ্জা পাচ্ছে কেন?

অনির্বাণ বলল, প্যান্টটাও খুলে একটা তোয়ালে জড়িয়েও বসতে পারেন।

আসল কারণটা জহর বলেই ফেলল। এ-সব লুকোনো সে পছন্দ করে না।

সে বলল, জামাটা খুলছি না, আমার গেঞ্জিটা একটু ছেঁড়া আছে।

অনির্বাণ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, আমার গেঞ্জিটা দেখবেন? একটা মোটে ফুটো ছিল, শ্রেয়া আঙুল দিয়ে সেটা আরও বড় করে দিয়েছে। যে-সব লোকের গেঞ্জি কক্ষনও ছেঁড়া থাকে না, আর মোজায় কক্ষনও ফুটো থাকে না তাদের আমি ভয় পাই।

শ্রেয়া দৌড়ে গিয়ে পাশের বাড়ি থেকে একটা শাড়ি এনে দিল, সেটা একেবারে নতুন আনকোরা তাঁতের শাড়ি। সুন্দর ধূপছায়া রঙের।

শ্রেয়া বলল, জুলি কাকিমা, তোমার জন্য তো অন্যের পরা শাড়ি আনতে পারি না। ওরা শাড়ি বিক্রি করে।

জুলি বললেন, ওমা, কিনে আনলি?

শ্রেয়া বলল, খবর্দার, দাম জিজ্ঞেস করবে না। এটা তুমি নিয়ে যাবে।

জুলি বললেন, এর বদলে তোকে যে একটা শাড়ি প্রেজেন্ট করব, তারও তো উপায় নেই। তুই পরবি না। বিয়ের দিন অন্তত একটা বেনারসি পরবি তো?

শ্রেয়া বলল, এখন থেকেই তুমি যদি সে জন্য বেনারসি কিনে রাখো তা হলে আমার বিয়ের দিন পৌঁছতে পৌঁছতে সেটা পচে যাবে।

জুলি তাকালেন অনির্বাণের দিকে।

শ্রেয়া বলল, তুমি কি ভাবছ, আমি ওকে বিয়ে করব? ও শিগগির আমেরিকা চলে যাবে, সব ঠিক হয়ে আছে। সেখানে গিয়ে আগে ও মেমসাহেবদের সঙ্গে প্রেম করবে, একটার পর একটা, তারপর ঠিক করবে বাঙালি না গুজরাটি না আমেরিকান বিয়ে করবে। তাই না অনির্বাণ?

অনির্বাণ বলল, আর শ্রেয়া তো যাচ্ছে জাপানে, জানেন তো?

জুলি বললেন, দু' জনে একেবারে দু' দিকে?

অনির্বাণ এ বাড়ির সব কিছু চেনে। রান্নাঘরে গিয়ে সে-ই চায়ের জল বসাল। শ্রেয়া আর একবার বেরিয়ে কিনে নিয়ে এল গরম গরম শিঙাড়া।

দুটো বাথরুম, একটাতে গিয়ে শাড়ি বদলে এলেন জুলি। আর শ্রেয়াদের পেড়াপিড়িতে জামা, গেঞ্জি, প্যান্ট খুলে একটা বড় তোয়ালে জড়িয়ে জহরকে বসতে হল পাখার নীচে।

একটু আগে ছিল লাল পাড়-সাদা শাড়ি, এখন ধূপছায়া রঙের শাড়িতে আরেক রকম দেখাচ্ছে জুলিকে। মাথার ভিজে চুল আঁচড়ে নিয়েছেন।

অনির্বাণ জহরকে বলল, আপনি মশাই ব্যায়াম করেন নাকি? এমন চওড়া বুক!

জহর বলল, না, ব্যায়াম-ট্যায়াম কখনও করিনি। কারখানায় হাতুড়ি পেটাই!

অনির্বাণ বলল, আমারও হাতুড়ি পেটানোই উচিত ছিল। শুধু পড়াশুনো করে করে অ্যাসিডিটি ধরে গেল।

শ্রেয়া বলল, যারাই পিএইচ ডি করে, তাদের প্রত্যেকেরই অ্যাসিডিটি থাকে!

তিনজনই হেসে উঠল এ কথায়। শুধু জহর রসিকতাটা ধরতে পারল না।

শ্রেয়া বলল, সেই জন্যই আমি নিজে ঘর মুছি, রান্না করি, বাথরুম পরিষ্কার করি, তাতে খানিকটা এক্সারসাইজ হয়। আমার বোনটা বড্ড কুঁড়ে, কিচ্ছু করতে চায় না। বাড়িতে থাকলে সর্বক্ষণ খালি গান শোনে।

জুলি জিজ্ঞেস করলেন, কোনও কাজের লোক নেই?

শ্রেয়া বলল, একজন বুড়ি মাসি আছে, সকালে আর সন্ধেবেলা আসে, রাত্তিরে থাকে না।

অনির্বাণ বলল, রান্নার ব্যাপারটা বাড়িয়ে বললে, একদিন খিচুড়ি রেঁধে সেটাই তিনদিন খাও। প্রায়ই রাত্তিরে চাইনিজ কিনে আনে।

শ্রেয়া বলল, তবে কি রোজ দু' বেলা রাঁধব নাকি? কিছু একটা খেলেই

হল, আমার বোনটাকে নিয়ে একটা সুবিধে, খাওয়ার ব্যাপারে কোনও নাক ছাঁটা নেই, যা দেব, অন্যমনস্কভাবে খেয়ে নেবে।

জুলি বললেন, 'নাক ছাঁটা' কথাটা কী সুন্দর। নাকটা কুঁচকে এই রকম করা, তাই না? কথাটা কতদিন পরে শুনলাম।

শ্রেয়া বলল, জুলি কাকিমা, তোমায় আমি একদিন রান্না করে খাওয়াব। কিন্তু আজ আমাকে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় বেরুতে হবে; ছ' টার সময় রিহার্সাল আছে।

জুলি সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, ওমা, সাড়ে পাঁচটা তো প্রায় বাজে। তুই তৈরি হয়ে নে।

শ্রেয়া বলল, আমার তো তৈরি হবার কিছু নেই। দেখলে না, এই পরেই দু' বার রাস্তায় বেরুলাম!

শ্রেয়া যথারীতি একটা জিন্‌স ও ঢোলা জামা পরা। মাথার চুলও ঠিক মতন আঁচড়ানো নেই।

জুলি শ্রেয়ার থুতনি ধরে সকৌতুকে বললেন, মেয়েটা একটুও সাজে না। এমন সুন্দর ফিগার, খানিকটা সাজলে-গুজলে কত ছেলের মাথা ঘুরিয়ে দিত!

শ্রেয়া বলল, ছেলেদের মাথা ঘোরানো একটা বাজে খেলা! আমি কখনও ওতে মজা পাইনি।

জহরের শার্টটা চলনসই হলেও প্যান্টটা কিছুই শুকোয়নি। জহর সেটাই পরে নিতে চায়, কিন্তু অনির্বাণ আর শ্রেয়া রান্নাঘরে গিয়ে সেটাকে সেঁকে সেঁকে অনেকটা শুকিয়ে আনল।

দোতলা থেকে নামবার সময় জহর দেখল, দুটো ঘর তালাবন্ধ, ব্যবহারই হয় না। নীচের দোকানগুলো রাত্তিরে বন্ধ হয়ে যায়, শুধু দুটি মেয়ে থাকে এত বড় বাড়িতে, ওদের ভয়-ডর নেই? হয়তো বিশ্বাসযোগ্য দারোয়ান আছে।

শ্রেয়ার রিহার্সালের জায়গা পার্ক সার্কাসে, জুলি তাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। অনির্বাণ অন্যদিকে যাবে, সে উঠল না।

গাড়ি ছাড়ার পর শ্রেয়া জহরকে বলল, আপনি থিয়েটার রোডে যাচ্ছেন তো? আমার রিহার্সাল ঘণ্টা দেড়েক, তারপর আমিও পৌঁছে যাব ওখানে। আবার আড্ডা হবে।

জুলিও বলল, হ্যাঁ, জহর, চলো আমার সঙ্গে। কাজ নেই তো কিছু?

উত্তর দেবার আগে জহর কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল।

তার আবার কী কাজ থাকবে? জুলি কাকিমার সঙ্গে সারা দুপুর কাটানো

হল, এর পরেও তাঁর বাড়িতে যাওয়া, তিনি খাওয়া-দাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, তারপর কখন শ্রেয়া আসবে, সেজন্য বসে থাকা, সেটা কি হ্যাংলামির মতন দেখাবে না? একদিনের পক্ষে এত বাড়াবাড়ি কি ঠিক?

সে বলল, না, আজ আর যাব না। আমার বাড়িতে কিছু লোকজন আসবে সন্ধেবেলা, আমি শিয়ালদার কাছে নেমে পড়ব।

অন্য দু'জন তাকে আর জোর করল না।

পথে একটা বইয়ের দোকান দেখে জুলি হঠাৎ বললেন, এখানে গাড়িটা একটু থামাও তো।

তিনি নিজে নেমে গিয়ে একটা বই কিনে আনলেন। হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা কলম বার করে জহরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বউয়ের নাম কী যেন?

জহর খানিকটা অবাক হয়ে বলল, শান্তা।

বইখানা রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা। তিনি ভেতরের পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন, স্নেহের শান্তা ও জহরকে প্রীতি উপহার। জুলি কাকিমা।

বইটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, তুমি পড়বে, ওকেও পড়াবে।

শ্রেয়া বলল, ও বইয়ের প্রায় অর্ধেক কবিতা আমার মুখস্থ। বাবা জোর করে পড়াতেন। ছোটবোনটা ফাঁকি দিয়েছে।

জুলি বললেন, তোমার ছোটবোনকে তো দেখলামই না। একদিন নিয়ে এসো।

জহর নেমে পড়ল শিয়ালদার মুখে।

নামার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা বদলে গেল। শিয়ালদার মানুষের ভিড়ের গন্ধ অন্যরকম। বহুক্ষণ একটানা বৃষ্টির জন্য চারদিক কাদা কাদা হয়ে আছে, এরই মধ্যে বসে আছে কমলা লেবুওয়ালা, চিরুনিওয়ালা, ঘুগনিওয়ালা। সব সময় এখানে শোনা যায় একটা স্থায়ী গোলমাল।

সব অফিস ছুটি হয়ে গেছে, স্টেশনের দিকে ধেয়ে আসছে হাজার হাজার মানুষ। কাছাকাছি সময়ের মধ্যে দু'টো নৈহাটি লোকাল, জহর দ্বিতীয়টায় বসবার জায়গা পেয়ে গেল।

তার হাতে একটা নতুন বই। ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের পড়ার বই ছাড়া আর কোনও বই সে কখনও কেনেনি। তার বাবাও বই কেনে না, শুধু খবরের কাগজের দিকে তার ঝোঁক। কী সুন্দর দেখতে বইটা। পড়ে কি সে কিছু বুঝবে? তবু চেষ্টা করতে দোষ কী।

উল্টোডাঙা থেকে তার অফিসের তিনজন সহকর্মী উঠল এ কামরাতেই। জহর সঙ্গে সঙ্গে বইটা ভরে ফেলল ক্যারি ব্যাগে।

ওদের মধ্যে একজন দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, এই যে, জহর সরকার। আজ থেকে তো আপনারই সরকার শুরু হল। শুনেছেন, আজ ইলেকশানের ডেট ডিক্লেয়ার করেছে? এখন ঘন ঘন আপনার নাম কাগজে বেরুবে।

এটা একটা বাঁধা রসিকতা। জহর সরকার নামে একজন আই এ এস অফিসার আছেন এ রাজ্যে। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তাঁর নাম দেখা যায়। নির্বাচনের সময় তাঁকেই দেওয়া হয় প্রধান দায়িত্ব, তখন কোন মন্ত্রী সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না, কার বক্তৃতায় জোরে মাইক বাজানো যাবে না, এই সব নির্দেশ জারি করেন। এই জহরের সহকর্মীরা তা নিয়ে তাকে খোঁচায়।

আই এ এস জহর সরকারকে এই জহর কখনও স্বচক্ষে দেখেনি। মনে-মনে সে ঠিক করে রেখেছে, যদি কখনও বিপদে কিংবা কঠিন কোনও সমস্যার মধ্যে পড়ে, তখন সে ওই জহর সরকারের সঙ্গে দেখা করবে, নিজের নামের সঙ্গে মিলে যাওয়া একজন লোককে কি তিনি সাহায্য করবেন না?

সহকর্মীটি জহরের কাছে এসে বসল, বাইরে ডিউটিতে গিয়ে আর অফিসে ফেরেননি? এ বেলা দেখিনি।

জহর বলল, হাফ বেলা ছুটি নিয়েছিলাম।

—শিয়ালদা থেকে কিছু বাজার করলেন নাকি?

—এই টুকিটাকি দু' একটা

—কাপড় কাচা সাবান ঢেলে বিক্রি করে, খুব শস্তায় দেয়।

—খুব শস্তা।

—আমাদের মুখার্জির ছেলে পরীক্ষায় ফেল করে সুইসাইড করতে গিয়েছিল শুনেছেন?

—তাই নাকি?

—তিন সাবজেক্টে গাড্ডু, মুখার্জির ধারণা তার ছেলে স্টার পাবে, হ্যা-হ্যা-হ্যা, বেঁচে গেছে কোনও রকমে কেসে

—যাক।

—এক একটা লোক থাকে, ফুল্‌স প্যারাডাইজে বাস করে, যেমন আমাদের এই মুখার্জিটা। ম্যানেজারের পোঁদে পোঁদে ঘোরে, শুনেছি তার বাড়ির বাজারও করে দেয়, ওর ধারণা ওতেই প্রমোশন হবে, হ্যা- হ্যা-হ্যা ইউনিয়ানের মিত্তিরদাকে বলে দিয়েছি, ওকে একটা কোঁতকা দিতে।

এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একেবারেই আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে না

জহরের। তবু সহকর্মীদের উপেক্ষা করা যায় না।

দূর থেকে আর একজন সহকর্মী চেঁচিয়ে বলল, অ্যাই নিতাই, জহরকে আমাদের সঙ্গে বেলঘরিয়ায় নামতে বল্।

নিতাই বলল, চলুন জহরদা, বেলঘরিয়া এসে গেল।

জহর বলল, বেলঘরিয়ায় নামব কেন?

নিতাই বলল, রমেশের বাড়িতে বসে কিছুক্ষণ গ্যাঁজাব।

জহর বলল, আমার ভাই বাড়িতে কাজ আছে।

নিতাই নিচু হয়ে জহরের বাহু ধরে বলল, গুলি মারুন কাজ। সে তো রোজই থাকে। সাড়ে ন'টার ট্রেন ধরবেন।

একেবারে ইচ্ছে না থাকলেও জহরকে নামতে হল ওদের সঙ্গে। সহকর্মীদের সঙ্গে দহরম মহরমের ভাব বজায় না রাখলে চাকরি রক্ষা করাই মুশকিল হয়ে পড়ে। সুবিমল দাস নামে একজন তাদের অফিসে যোগ দিয়েছিল, ভদ্রলোক এম এস-সি পাশ, অন্যদের থেকে যোগ্যতা বেশি, প্রথম থেকেই একটা গেরেমভারি ভাব নিয়ে থাকত, যেন দয়া করে এই কাজে যোগ দিয়েছে। সবাই জানে, অনেক এম এস সি পাশ ছেলে এখন চাকরি না পেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, সুতরাং অন্যরা এই সুবিমল দাসকে বেশি মর্যাদা দেবে কেন? সবাই মিলে এমন তার পেছনে লাগল যে সুবিমলের পাগল হবার মতন অবস্থা, ছেড়েই দিল চাকরি।

জহর তো নিতাইদেরই মতন একজন। এর আগেও অনেকবার সে এদের সঙ্গে অফিসের পর আড্ডা দিয়েছে। এক একজনের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে খাওয়াবারও ব্যাপার আছে, জহরও তার বাড়িতে একবার বারোজনকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে। কিন্তু আজ সে কিছুতেই ওদের সঙ্গে সুর মেলাতে পারছে না। বাসুদেবদের বাড়ির ছাদে আড্ডা, চিকেন রোল কিনে আনা হয়েছে, আর কয়েক বোতল বিয়ার, কিন্তু আড্ডা মানে অফিসেরই গল্প, অফিসের বাইরে এসেও এরা অফিসের কথা ভুলতে পারে না, এ মুখার্জি কী বললেন, ছোট সাহেব কী রকম টেঁটিয়া, ইউনিয়নের কে কে এবার ভোটে দাঁড়াবে...।

এতদিন লক্ষ করেনি, আজই প্রথম জহরের মনে হল, তাদের ভাষা আর শ্রেয়া-অনির্বাণ-জুলি কাকিমাদের ভাষা অনেক আলাদা। ওরা তো সব সময় সাহিত্য বা বিজ্ঞান বা পণ্ডিতি আলোচনা করে না, সাধারণ ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করে, তবু সে ভাষাও অন্যরকম।

নিতাই-বাসুদেবদের সঙ্গে কথা চালিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে জহর। একবার সে ভাবল, এরা যদি জানত, আজ জহর

সরকারের মতন সাধারণ একজন মেকানিকের বৃষ্টি-ভেজা প্যান্ট শুকিয়ে দিয়েছে দু'জন পিএইচ ডি'র ছাত্রছাত্রী! জুলি কাকিমার মতন একজন বনেদি বাড়ির মহিলা কী অম্লান বদনে জহরের পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি ভিজলেন পরেশনাথের বাগানে। জহর যদি সে-সব কথা এখানে বলতে যায়, এরা মনে করবে ডাহা গুল।

সে-সব কথা এখানে বলার প্রশ্নই ওঠে না।

আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ায় জহরের ধাঁধার মতন মনে হল। অনির্বাণ তো বৃষ্টিতে ভেজেনি, তবু শ্রেয়া জানল কী করে ওর জামার তলার গেঞ্জিতে ফুটো আছে। আঙুল দিয়ে শ্রেয়া সেই ফুটো বড় করে দিয়েছে। অনির্বাণ ইচ্ছে করে জামা খুলেছিল?

ভাবলেই শরীরটা কেমন শিরশির করে। অবশ্য, ওরা দু'জন অবিবাহিত ছেলেমেয়ে, ওদের যা খুশি করার অধিকার আছে। জহর একজন বিবাহিত, নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারী মানুষ, তার ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার কী দরকার।

চার

'সোনার তরী' বিল্ডিং-এরই চারতলার এক অ্যাপার্টমেন্টে জলের মেশিনটা কোনও কাজই করছে না, অথচ মাত্র সাতমাস আগে বসানো হয়েছে, এখনও গ্যারান্টি পিরিয়ড শেষ হয়নি, যিনি কিনেছেন সেই পাঞ্জাবি মহিলাটি খুব বকাবকি করছেন টেলিফোনে। সার্ভিসিং-এর জন্য দুটি ছেলেকে পাঠানো হয়েছিল, তারা কিছুই সুবিধে করতে পারেনি। অগত্যা কম্পানি থেকে পাঠানো হয়েছে জহরকে।

এইসব ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রটা পাল্টে সম্পূর্ণ নতুন একটা দেওয়ার কথা, তবু জহর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছে।

প্রথমেই তো ভদ্রমহিলার উগ্র মেজাজের ঝাঁজ অনেকটা সহ্য করতে হল জহরকে। ভদ্রমহিলাকে দোষ দেওয়া যায় না, পয়সা দিয়ে মেশিন কিনেছেন, এত তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে গেলে রাগ তো হবেই।

রান্নাঘরের গরমে জহরকে এক ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হল, ভদ্রমহিলা গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে।

এর মধ্যে কেউ একজন বেল দিল বাইরে থেকে। দরজা খোলার পর ভদ্রমহিলা তাকেও বকুনি দিলেন একচোট। বাইরের লোকটি কী বলল, জহর শুনতে পায়নি। ভদ্রমহিলা হিন্দি-ইংরিজি মিশিয়ে বললেন, এখন কটা বাজে? দুপুর আড়াইটে। এই সময় কেউ আসে? দুপুরবেলা কারও

বাড়িতে যেতে নেই, এই ভদ্রতাটুকুও জানেন না? যান, বিকেল পাঁচটার পর আসবেন। না, না, এখন আমি কোনও কথাই শুনব না। যতই আপনি রেফারেন্স-চিঠি নিয়ে আসুন।

সাড়ে তিনটের সময় জল বেরুতে লাগল ছড়ছড়িয়ে। আলট্রা ভায়োলেট রে কাজ করছে ঠিক মতন। এরপরেও বেশ কিছুক্ষণ কল চলবার পর সে ভদ্রমহিলাকে বলল, দেখে নিন, ম্যাডাম, এখন ঠিক কাজ করছে!

ভদ্রমহিলা কল চালিয়েও সন্তুষ্ট না হয়ে আগের মতনই মেজাজে বললেন, আবার যে কালকেই খারাপ হবে না, তা কী করে বুঝব?

জহর প্রথম থেকেই শান্তভাবে উত্তর দিয়েছে, এবারেও বলল, ম্যাডাম, আমি একটা নতুন মেশিন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। সেটাও আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি সাত দিনের জন্য। কিংবা যদি চান, পুরনোটার বদলে নতুনটাই এখন বসিয়ে দিয়ে যেতে পারি। তবে, আমি বলতে পারি, আর কোনও গণ্ডগোল হবে না।

এবারে ভদ্রমহিলা হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে বললেন, আবার খারাপ হলে আপনারা আসবেন?

জহর বলল, নিশ্চয়ই। কাস্টমার যতক্ষণ না পুরোপুরি স্যাটিসফায়েড হয়—

ভদ্রমহিলা বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ। বসুন, একটু মিষ্টি খেয়ে যান।

জহর বলল, ধন্যবাদ। আমি ডিউটির সময় কিছু খাই না।

ভদ্রমহিলা কিছুটা ইতস্তত করে দু'খানা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন জহরের দিকে।

জহর এবারেও প্রত্যাখ্যান করে বলল, ও-সবের দরকার নেই। এই কাজ করার জন্যই তো কম্পানি আমাকে মাইনে দেয়!

বাইরে বেরিয়ে এসে জহর একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। যে-কোনও শক্ত কাজই করে ফেলতে পারলে একটা আনন্দ হয়। সে একজন শিক্ষিত মেকানিক, কিন্তু অধিকাংশ বাড়িতেই তাকে সাধারণ মিস্তিরি মনে করে, দশ-কুড়ি টাকা বকশিশ দিতে চায়। মাসের শেষে পকেটে টানাটানি পড়লেও জহর আজ পর্যন্ত কখনও ওই টাকা নেয়নি, বরং ফিরিয়ে দেবার সময় সে যে হাসিটা দেয়, সেই হাসিতে বিশেষ সুখ আছে।

সে একটা সিগারেট ধরাল।

আর দু' তলা ওপরে জুলি কাকিমাদের ফ্ল্যাট। একবার ঘুরে এলে কেমন হয়? যা গরম আজ, জুলি কাকিমার কাজের মহিলাটি চমৎকার শরবত

বানায়!

তারপরই মনে পড়ল, একটু আগেই সে শুনেছে, দুপুরবেলা কারও বাড়িতে যেতে নেই। সেটা ভদ্রতা নয়। এর আগে সে এ-সব না জেনে গেছে দু'একবার।

জুলি কাকিমা এই সময়টায় পিয়ানো প্র্যাকটিস করেন, বিরক্ত হলেও তো মুখে কিছু বলবেন না। আমার হাতে সময় আছে বলেই আমি অন্য একজনের কাছে যাব, কিন্তু তার তখন সময় আছে কি না, সেটা বিবেচনা না করা অন্যায়ই তো বটে।

যাবে না ঠিক করে জহর লিফ্‌টের কাছে এসে দাঁড়াল।

ওপর থেকে নেমে আসছে লিফ্‌ট, চারতলায় থামতেই জহর দেখল, তার মধ্যে রয়েছে অখিল।

অখিল তাকে দেখে বলল, কী, ওপরে যাচ্ছ? এটা নীচে নামছে।

ভেতরে ঢুকে এসে জহর বলল, না, আমিও নীচেই যাব।

অখিল হেসে বলল, আমাকে দেখে মত বদলালে নাকি?

জহর একটু অবাক হল, এ আবার কী কথা? জুলি কাকিমার কাছে যাবে কি যাবে না, সে জন্য অখিলের মতামত নিতে হবে নাকি?

সে বলল, আমি এ বিল্ডিং-এ অন্য কাজে এসেছিলাম।

অখিল বলল, তাও তো বটে, না হলে তুমি চারতলায় দাঁড়াবে কেন? আমি এসেছিলাম স্যাটার ডে ক্লাবের মেম্বারশিপ ফর্ম দিতে। ওঁরা এতদিনেও কোনও ক্লাবের মেম্বার হননি। এমনিতে এখন মেম্বার হওয়া শক্ত, আমি করিয়ে দেব। আমার অনেক চেনা আছে।

নীচে নেমে এসে সে বলল, এখন কোথায় যাবে?

—অফিসে ফিরব।

—ফিরতেই হবে? চলো, কোথাও গিয়ে একটু বসি। তাজ বেঙ্গলে যাবে?

—তাজ বেঙ্গল .... মানে হোটেল? ওরে বাবা, ও-সব বড় বড় জায়গায় আমি গিয়ে কী করব?

—আরে চলোই না।

—না ভাই। আমাদের মতন লোকের ও সব জায়গায় মানায় না। অফিসেই যাই।

—মানানো না মানানোর কী আছে? তুমি কে, কী, তা কি তোমার গায়ে লেখা থাকে? পকেটে পয়সা থাকলেই হল। না, না, তোমাকে পয়সা খরচ করতে বলছি না। আমারও নিজের পয়সা যাবে না, আমার কম্পানির

এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট আছে ... ঠিক আছে, চলো, কাছাকাছি এক জায়গায় বসি। তুমি নিউ রয়েলে খেয়েছ কখনও?

—না। চিনিই না।

—ওখানে খাবারটা ভাল দেয়।

—এখন আবার কী খাবার খাব। এখন কি খাওয়ার সময় নাকি?

—খাওয়া মানে স্ন্যাক্স। ড্রিংকসের সঙ্গে কাবাব টাবাব। ওরা বটি কাবাব খুব ভাল করে।

—ভাই অখিল, জানো তো, আমি ড্রিংক করি না।

—করো না মানে কী? একদিন নতুন করে শুরু করলেই তো হয়। চিরকাল গাঁইয়া থাকবে নাকি?

—গ্রামে থাকি, গাঁইয়া ছাড়া কী হব?

—সে কথা হচ্ছে না। শহরেও অনেক গাঁইয়া থাকে। তোমার কি কোনও সংস্কার আছে? কিংবা কারও কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ?

—সংস্কার-টংস্কার জানি না। আমার সাধ্যে কুলোবে না। তুমি আজ আমায় খাওয়াবে, কাল তো আমি নিজের পয়সায় খেতে পারব না। যদি নেশা ধরে যায়, রোজ রোজ আমায় কে খাওয়াবে?

—যারা ড্রিংক করে তাদের ঠিক পয়সা জুটে যায়। মাতালদের একটা আলাদা ভগবান আছেন, তিনি দেখাশুনো করেন। তুমি কোনও মাতালকে কখনও গাড়ি চাপা পড়তে দেখেছ? সাধারণ লোকেরা গাড়ি চাপা পড়ে, কিন্তু মাতালরা ঠিক বেঁচে যায়।

—আমাকে মাপ করো ভাই।

—ঠিক আছে, আমি জোর করব না, তুমি কোল্ড ড্রিংকস খাবে।

কাছেই একটি সুদৃশ্য হোটেল। তার চত্বরের এক পাশে পানশালা। ভেতরে ঢোকার পরই আরাম লাগল। বাইরে অসহ্য গুমোট গরম। এখানে বেশ ঠাণ্ডা। আধো-অন্ধকার পরিবেশ, অনেকগুলি টেবিল, প্রায় সবই ভর্তি, লোকেরা কথা বলছে নিচু গলায়।

ওরা দরজার কাছেই একটা টেবিলে বসল।

অখিলের জন্য হুইস্কি আর জহরের জন্য ঠাণ্ডা পানীয় এল, অর্ডার দেওয়া হল খাবারের। সোডা মিশিয়ে, খুব তৃষ্ণার্তের মতন একটা লম্বা চুমুক দিল অখিল।

জহর জিজ্ঞেস করল, তুমি কি রোজই মদ খাও?

অখিল হেসে বলল, এই ধরনের কথা অনেকদিন শুনিনি। সাধারণত যাদের সঙ্গে মিশি, কেউ এ কথা জিজ্ঞেস করে না। রোজ চা খাই, এটা

খেতে দোষ কী? দুটোই তো নেশার দ্রব্য। তাই না?

—তা অবশ্য ঠিক। তবে—

—খরচের কথা বলছ তো? হ্যাঁ, ড্রিংকসে খরচটা বেশি হয়। তা হলে একটা কথা শোনো। আমিও তো বড়লোকের ছেলে নই, সাধারণ ফ্যামিলি থেকে এসেছি, এটা অ্যাফোর্ড করি কী করে? মানুষের যত খরচ বাড়ে, ততই তার রোজগার করার জেদটাও বাড়ে। আমি ড্রিংক করি বলেই বেশি রোজগার করি, নইলে সাধারণ চাকরি-বাকরি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতাম।

—তুমি কীসের ব্যবসা করো?

—সব কিছুর। অর্ডার সাপ্লাই। ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট। আমার নিজেরই কম্পানি, তবে একজন স্লিপিং পার্টনারও আছে। তুমি কি ওই চাকরিই সারাজীবন চালিয়ে যাবে?

—অন্য চাকরি আর পাব কোথায়?

—সারাজীবন ওই মেকানিকের চাকরি? দ্যাট ইজ রিডিকুলাস! ওর থেকে বেরিয়ে এসো।

—তার মানে?

—যদি সমাজের ওপরের দিকে উঠতে চাও, ঝুঁকি নিতে হবে। বাপের টাকা যদি না থাকে, নিজের টাকা করতে গেলে ডেসপারেট হতে হয়। আমি যা যা করেছি, তুমি ভাবতেও পারবে না।

—তুমি ব্যবসা শুরু করলে নিজে নিজে?

—সে অনেক ব্যাপার আছে। শোনো জহর, তোমাকে আমি একটা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। যদি জীবনে বড় কিছু করতে চাও, প্রথমেই ওই চাকরিটা ছাড়ো!

—অ্যাঁ, চাকরি ছাড়ব? তা হলে খাব কী?

—এই তো, এই তো পেটি বুর্জোয়াদের মতন কথাবার্তা। খাওয়াটা কোনও ব্যাপার নাকি! খাওয়ার চিন্তা না করে সিঁড়ির চিন্তা করো। সিঁড়ি, সিঁড়ি, যে-সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবে!

—আমি তো একা নই, আমার বুড়ো বাবা, বউ, ছেলে-মেয়ে...

—দরকার হলে ওদেরও ছাড়তে হবে।

—ওরে বাবা, ও সিঁড়ি আমার জন্য নয় তা হলে।

অখিল হো-হো করে হেসে উঠল। এর মধ্যে দ্বিতীয় পেগ হুইস্কি এসে গেছে। কাবাবগুলো সত্যি খুব সুস্বাদু। এ রকম এয়ার কন্ডিশনড দামি মদ্যপানশালায় জহর আগে কখনও আসেনি। পুরুষদের সঙ্গে নারীও রয়েছে কয়েকজন। একটি মেয়ে এইমাত্র সামনে দিয়ে চলে গেল, তার কী

উগ্র সাজ পোশাক, পেটটা একেবারে খোলা। মাখনের মতন তকতকে পেট।

এ জগৎটায় জহর একেবারেই বেমানান। অবশ্য সে এ জগতে ঢুকতেও আগ্রহ বোধ করছে না। সে অখিল হতে পারবে না।

অখিল তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, আরে আমি কি সত্যি তোমার বউ ছেলে-মেয়েদের ছাড়তে বলছি নাকি? ওটা কথার কথা। আমার বউ ছেলেমেয়ে নেই? আমার মেয়ে তো বড় হয়ে গেছে, এত ভাল হয়েছে মেয়েটা! তুমি আমার কম্পানিতে জয়েন করবে?

জহর বলল, আমি মেশিন পত্তরের কাজ কিছু কিছু বুঝি। ব্যবসার তো কিছু বুঝি না?

অখিল বলল, তা শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে পারি। স্মার্ট হতে হবে, লোকজনের সঙ্গে মিশতে হবে। প্রথম দিকে অবশ্য টাকাকড়ি বিশেষ পাবে না। যত বেশি অর্ডার আনতে পারবে, তত বেশি কমিশন।

জহর খুব একটা উৎসাহ না দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, তার আগে কি এ চাকরি ছাড়তে হবে?

অখিল বলল, অবশ্যই! তবে এক্ষুনি কিছু ঠিক করতে বলছি না। ভেবে দ্যাখো! বাড়ির লোকের সঙ্গে পরামর্শ করো। একবার লাইনটা বুঝে গেলে তুমি তারপর নিজেই ব্যবসা শুরু করে দিতে পারবে! তুমি একটু বসো, আমি আসছি।

অখিল উঠে গিয়ে অন্য টেবিলের দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘরটা। জহরের চোখ জ্বালা করছে, যদিও সে নিজেও টানছে সিগারেট।

সিগারেট, চা, এগুলোও নেশা। সিগারেটেও নেহাত কম পয়সা খরচ হয় না। সে কেন সিগারেট ছাড়তে পারছে না? মানুষের কি একটা না একটা নেশা চাই-ই? বাবার যেমন নস্যি। শান্তার পানপরাগ না হলে চলে না।

অখিল ফিরে এল আর একটি ভর্তি গেলাশ হাতে নিয়ে।

জহর সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করল, তুমি আরও খাবে?

অখিল বললে, মোটে তো তিনটে হল। এতে আর কী হবে?

—কটা খেলে নেশা হয়?

—সেটা ডিপেন্ড করে, এক একজনের এক একরকম। আমার সাত-আটটা চলে।

—অখিল, তুমি বাড়িতেও এটা খাও?

—খাব না কেন? তুমি ভাবছ, বউ টউ-এর কাছে লুকিয়ে খাই কি না। এটা ভাই লুকোনো যায় না।

—বাড়িতে বোতল কিনে খেলে তো অনেক শস্তা হয়। এখানে নিশ্চয়ই অনেক বেশি পয়সা লাগে, তবু এত লোক এইসব জায়গায় আসে কেন?

—তুমি দেখছি, মহা সরল রয়ে গেছ। এখানে যারা এসেছে, তারা অধিকাংশই বিজনেসের আলোচনা করছে। বিজনেসের জন্য পার্টিদের ডাকতে হয় এ-সব জায়গায়। বেশি পয়সা রোজগার করতে গেলে পয়সা খরচও করতে হয়। আমি যদি একমাস কোনও বারে না যাই, বিজনেসের লাইনের লোকেরা ডেফিনিটলি ভাববে, আমার অবস্থা পড়ে গেছে!

—তা হলে তুমি কেন আমায় এখানে নিয়ে এলে? আমি তো তোমার বিজনেসের কোনও কাজে লাগব না।

—মাঝে মাঝে তো আড্ডা দিতেও ইচ্ছে করে। তা ছাড়া, তুমি যে আমার কোনও কাজে লাগবে না; তা জোর দিয়ে বলা যায় না। কে যে কখন কাজে লাগে, তার কিছু ঠিক নেই। তোমাদের অফিসেও তো নানারকম পারচেজ হয়। তুমি তোমাদের পারচেজ ম্যানেজারের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে প্যারো না?

জহর উত্তর দেবার আগেই একটি লম্বা, সুট-টাই পরা লোক এ টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত কিছু না বলে কটমট করে তাকিয়ে রইল অখিলের দিকে।

তারপর কর্কশ গলায় বলল, কী হল, অ্যাঁ?

অখিল বলল, আমি পরশু টেলিফোন করলুম—

লোকটি বলল, পরশু, অ্যাঁ, পরশু? তারপর দু'দিন কেটে গেছে।

লোকটিকে দেখে অখিল যে বেশ ঘাবড়ে গেছে, তা স্পষ্ট বোঝা গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে লোকটিকে টেনে নিয়ে গেল এক কোণে।

জহর তাদের কথা শুনতে না পেলেও দু'জনের হাত-পা নাড়া দেখে বুঝল, দু'জনেই বেশ উত্তেজিত। ক্রমেই সেটা বাড়ছে।

হঠাৎ লোকটি এক ঘুঁষি কষাল অখিলের চোয়ালে। অখিল পড়ে গেল পাশের টেবিলে, ঝনঝন করে ভাঙল দুটো কাচের গেলাস।

লোকটি আবার অখিলকে মারবার জন্য হাত তুলতেই জহর তড়াক করে উঠে গিয়ে লোকটার হাত চেপে ধরে বলল, কী ব্যাপার?

লোকটি হিংস্র মুখভঙ্গি করে বলল, এটা আবার কে? সরে যা শুয়োরের বাচ্চা!

এবার লোকটিকে ঘুঁষি মারার ন্যায্য অধিকার আছে জহরের। লোকটির

তুলনায় জহরের গায়ের জোর কম নয়।

কিন্তু সে মারবার আগেই কয়েকজন লোক এসে দু'জনকে আলাদা করে দিল।

একজন স্টুয়ার্ড টানতে টানতে নিয়ে গেল লোকটিকে। সে তখনও গজরাতে গজরাতে ছুড়ে দিয়ে গেল কয়েকটা কুৎসিত গালাগাল।

অখিলের নাক দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়েছে। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে রুমাল চেপে ধরল নাকে।

পাশের টেবিল থেকে একজন বেশ উৎফুল্ল গলায় বলল, কী অখিলবাবু, আপনি ছেড়ে দিলেন? ব্যাটা আপনাকে মারল, আপনি উল্টে একটা ঝাড়লেন না?

অখিল শান্ত, বিষাক্ত গলায় বলল, ওকে আমি নিজের হাতে মারব না। ওর ভিটে-মাটি চাটি করে দেব।

জহর কিছুই বুঝতে পারছে না।

টি ভি সিরিয়ালে সে এরকম দৃশ্য দেখেছে। বাংলায় না, হিন্দিতে। সেখানে অবশ্য মাত্র একটি ঘুঁষিতে থামে না।

জহর তাকিয়ে রইল অখিলের দিকে। ও নিজে থেকে না বললে কি কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত?

অখিল কিছু না বলে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানছে।

জহর বলল, অখিল, আমি এবার উঠব।

অখিল বলল, হ্যাঁ চলো, আমিও যাব।

তার ইঙ্গিতে বেয়ারা বিল নিয়ে এল। কত টাকার বিল হয়েছে তা জানার জন্য কৌতূহল হলেও জহর জানে, সেটা উঁকি দিয়ে দেখা ভদ্রতা নয়।

টাকার বদলে অখিল পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দিল।

ক্রেডিট কার্ডের কথা জহর জানে। ক্যাশ টাকা না থাকলেও ওই কার্ড দিলে ইচ্ছে মতন খরচ করা যায়। প্লাস্টিক মানি। তবে জহর এ পর্যন্ত তার চেনাশুনো কাউকে ওই কার্ড ব্যবহার করতে দেখেনি। নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা রাখতে হয়।

সেখান থেকে বেরিয়ে অখিল বলল, চলো, আর একটা জায়গায় বসা যাক।

জহর বলল, না, না, আমি আর কোথাও বসব না। অফিসে তো আর যাওয়াই হল না। এবার বাড়ি ফিরব।

অখিল বলল, এর মধ্যে বাড়ি? এখনও সন্ধে হয়নি। চলো হোটেল গ্রিনে

বসি, ওখানে আজে বাজে লোক যায় না।

এবার কৌতূহল দমন না করতে পেরে জহর জিজ্ঞেস করল, এ লোকটা কে?

অখিল অবহেলার সঙ্গে উত্তর দিল, এ হারামির বাচ্চাটা একটা স্মাগলার।

—স্মাগলার? তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কী করে?

—সোসাইটিতে ঘুরতে ফিরতে গেলে কত লোকের সঙ্গেই তো মিশতে হয়। কার কী পরিচয়, তা কি সঠিক জানা যায়?

—স্মাগলাররা তো ডেঞ্জারাস হয়।

—ফুঃ! আমি গ্রাহ্য করি না। এরকম কত দেখেছি! আমি ওকে এমন শিক্ষা দেব।

—অখিল, আমি তা হলে ওই বাসটায় উঠে পড়ছি।

—আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। জহর, তুমি আমার হয়ে ওকে মারতে গিয়েছিলে। আমি এত অবাক হয়ে গেছি।

—বন্ধুর গায়ে হাত দিলে সবাই সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়।

—না যায় না, আজকাল সবাই নিজের গা বাঁচিয়ে চলে। অন্যের ঝামেলায় কেউ জড়ায় না। তুমি এখনও অনেকটা সরল আছ। ওই হারামির বাচ্চাটা তোমার মুখ চিনে রেখেছে। কোথাও তোমাকে একলা পেলে ঝঞ্ঝাট করতে পারে। তুমি একটু সাবধানে থেকো।

—আমি মিস্তিরি মানুষ, আমার ও কী করবে? ও তোমাকে মারল কেন?

—সে-সব তোমার শোনার দরকার নেই। ও-সব লাইনে এ রকম হয়। ওই দেখো, ওই দেখো, শ্রেয়া যাচ্ছে উল্টো ফুটপাথ দিয়ে, বোধহয় জুলি বউদির কাছেই যাচ্ছে। ওদের কাছে এ-সব কথা বলবার দরকার নেই।

অখিল দু'বার শ্রেয়ার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল।

শ্রেয়া হাঁটছে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি, হর্নের আওয়াজ, শ্রেয়া শুনতে পেল না। এগিয়ে গেল অনেকখানি।

অখিল বলল, ঠিক আছে, বারে যেতে হবে না, চলো, বউদির কাছেই যাই।

জহরের ইচ্ছে ছিল না, তবু জোর করেই নিয়ে গেল অখিল। মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।

শ্রেয়ার সঙ্গে ওরা উঠল একই লিফ্‌টে। শ্রেয়া তার সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, তার নাম লিপি বিশ্বাস, সে একটি কলেজে পড়ায় ও

কবিতা লেখে।

আলাপের সঙ্গে সঙ্গে অখিল বলল, লিপি বিশ্বাস! আপনার কবিতা অনেক পড়েছি। আপনি তো দারুণ লেখেন।

জহরের এরকম কিছু বলার উপায় নেই। জুলি কাকিমা যে সঞ্চয়িতাটা উপহার দিয়েছেন, সেটাই পড়া শুরু করেনি এখনও।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা শুনতে পেল, ভেতরে পিয়ানো বাজছে।

শ্রেয়া বলল, এই রে, কাকিমা প্র্যাকটিস করছেন। এখন কি ডাকা ঠিক হবে?

অখিল বলল, ছ'টা বেজে গেল, সাধারণত তো এতক্ষণ...

সে বেল টিপে দিল।

দরজা খুলে দিলেন জুলি নিজে। হাউসকোট পরা। স্বভাবসিদ্ধভাবে মধুর হেসে বললেন, ওমা, তোমরা একসঙ্গে কোথা থেকে এলে? এসো, এসো—

শ্রেয়া বলল, আপনি বাজাচ্ছিলেন, ডিসটার্ব করলাম আমরা।

জুলি বললেন, মোটেই না। আমি তো যখন তখন বাজাই। বেলা ছুটি নিয়েছে, ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই, কিছুই তো করবার নেই।

শ্রেয়া বলল, বেলাদি ছুটি নিয়েছে, তা হলে তো আপনার খুব মুশকিল।

জুলি বললেন, ও সাধারণত ছুটি নেয় না। ইদানীং ওর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। হ্যাঁ, মুশকিল তো হয়ই। দোকান থেকে কোনও জিনিসপত্র আনাতে হলে লিফ্‌টম্যানদের ধরতে হয়।

অখিল বলল, আর একটি কাজের লোক রাখুন। আমি জোগাড় করে দেব?

জুলি বললেন, প্রথম যখন আসি, তখন একটি ছেলেকে রেখেছিলাম। ছেলে থাকলে অনেক সুবিধে হয়। সেই রঘু নামের ছেলেটি বেশ চটপটে ছিল, রান্নার হাতও ভাল, শুধু মাঝে মাঝে নীচে গিয়ে অন্য কাজের লোকদের সঙ্গে আড্ডা দিত, এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, তার আর একটা দোষ ছিল, বকুনি দিলে মুখে মুখে জবাব দিত, ডাক্তার বোস আবার তা সহ্য করতে পারেন না। মিলিটারি মেজাজ তো। একদিন রঘু জোরে জোরে কথার উত্তর দিয়েছে, উনি তক্ষুনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। সেই থেকে আর উনি পুরুষ কাজের লোক রাখতে চান না।

লিপি বলল, কেউ বেল দিলেই আপনি দরজা খুলে দেন, এটা কিন্তু সেফ নয়। দরজায় তো চেন আছে, একটু খুলে আগে দেখে নেবেন।

জুলি বললেন, হ্যাঁ, সেটা অভ্যেস করতে হবে। মনে থাকে না।

শ্রেয়া বলল, আমরা চা খাব। আমি চা বানিয়ে নিচ্ছি।

জুলি লাজুকভাবে হেসে বললেন, এই রে, চা যে ফুরিয়ে গেছে। লিফ্‌টম্যানকে দিয়েছি, ওদের সময় হলে তবে তো আনবে। কফি আছে, কফি খাবে?

শ্রেয়া বলল, উঁহুঃ। আমি কফি ভালবাসি, কিন্তু এখন মনটা চা-চা করছে।

অখিল বলল, আমি চট করে চা কিনে আনছি। টি ব্যাগ?

অখিল সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

এ কাজটা কি জহর করতে পারত না? চা কিনতে আর ক'টা টাকাই বা লাগে! অথচ ঠিক সময় তার মনে পড়ে না। সে লজ্জা বোধ করল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল অখিল। ততক্ষণে শ্রেয়া জল চাপিয়ে দিয়েছে।

অখিল অবশ্য চা খাবে না। সে বসেই ছিল, সে তিন পেগ হুইস্কি খেয়ে এসেছে, এখন চা চলবে না।

অখিলকে দেখলে অবশ্য বোঝা যায় না কিছু। শুধু চোখ দুটো একটু লালচে, কথা জড়ায়নি।

লিপিকে দেখিয়ে সে জুলিকে বলল, বউদি, এর সঙ্গে তোমার ভাল করে আলাপ হয়েছে? তোমার ক্লাবে এবার একজন কবি যুক্ত হল। ইনি খুব নামকরা কবি।

জুলি বললেন, আমার ক্লাব?

অখিল বলল, হ্যাঁ, এখানে আমরা একটা ক্লাব করব, তুমি তার প্রেসিডেন্ট। লিপি, আসবেন তো রেগুলার?

শ্রেয়া বলল, আজকাল কাকাকে দেখতেই পাই না।

জুলি বললেন, উনি খুব জড়িয়ে পড়েছেন। যখন যেটা ধরেন, খুব ইনভলভ্‌ড হয়ে যান। রাত দশটার আগে ফিরতেই পারেন না।

অখিল মুখ ফিরিয়ে জহরের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপে দিল গোপনভাবে।

জহর বুঝতেই পারল না, এটা কীসের ইঙ্গিত।

অখিল আবার সামনে ফিরে বলল, আমি তো দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। একটা ড্রিংক নিই?

অনুমতির অপেক্ষা না করে সে উঠে গিয়ে কাবার্ড খুলে একটা স্কচের বোতল বার করল। গুনগুন করে গাইতে লাগল, এমনি করেই যায় যদি

দিন, যাক না।

জহর ভাবল, একটু আগেই সে আর অখিল অন্য রকম একটা পরিবেশে ছিল। যেখানে বিজনেসের প্রয়োজনে লোকে মদ খেতে যায়, হাজার হাজার টাকা ওড়ায়। যেখানে একজন স্মাগলার প্রকাশ্যে এসে ঘুষি মারে। কেনই বা মারে?

এখানে অখিল যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

সে লিপির কাছে গিয়ে বলল, আপনি তো টি ভি-তে কবিতা পড়েন?

লিপি খানিকটা চাপা গর্বের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, ওরা ডাকে। যেতে হয় মাঝে মাঝে।

অখিল বলল, আমি শুনেছি আপনার কবিতা। মনে আছে। আপনার কবিতার বইও আছে নিশ্চয়ই?

লিপি বলল, তিনখানা। একটা সদ্য বেরিয়েছে।

অখিল বলল, কিনতে হবে। কোথায় পাওয়া যাবে।

লিপি বলল, কলেজ স্ট্রিটে পাবেন। বই মেলায় অনেক দোকানেই, যদি চান আমার প্যাবলিশারের ঠিকানা দিতে পারি।

অখিল বলল, হ্যাঁ, লিখে নেব। আপনার কোনও কবিতা মুখস্ত নেই? একটা শোনান না।

লিপি বলল, পুরোটা মনে থাকে না, কয়েক লাইন......

শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী রে, শোনাব?

সারা মুখে হাসি ভরিয়ে শ্রেয়া বলল, আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন, শোনাবে তো নিশ্চয়ই। বাবারে বাবা, কবিরা কী দুর্বল হয়, একটু প্রশংসা শুনলেই গলে যায়। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, অখিলবাবু আগে তোমার নামও শোনেননি। একটা কবিতাও পড়েননি। এ-সব হচ্ছে ভাব জমাবার কায়দা!

জহরেরও এ রকম একটু একটু সন্দেহ হচ্ছিল যে অখিল আন্দাজে ঢিল মারছে। শ্রেয়া একেবারে মুখের ওপর বলে দিল?

অখিল একটুও অপ্রস্তুত হল না। সেও হা হা করে হেসে উঠে বলল, শ্রেয়া ঠিক ধরে ফেলেছে। ও মেয়ের এত বুদ্ধি, ওর সামনে কি পার পাবার উপায় আছে? তবে তুমি যাই-ই বলো শ্রেয়া, ভাব জমাবার চেষ্টা করা কি অন্যায়?

জুলিও হাসতে লাগলেন।

জহর এ ভাবে কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে পারবে না। তা ছাড়া, সে বিবাহিত, কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে এ কথাটা

সে ভুলতে পারে না। অখিলও বিয়ে করেছে, নিজেই বলল, ওর বেশ বড় মেয়ে আছে। কিন্তু অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে বেশ প্রেম প্রেম ভাব করে। বিবাহিত লোকদেরও এই অধিকার থাকে?

পাঁচ

এ যেন গরিবের কুটিরে রাজা ও রানির আবির্ভাব। সেই রকমই মনে হতে পারে।

এ গলিতে গাড়ি ঢোকে না। মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে হেঁটে এসেছেন দু' জনে, লোককে ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে। জানলা দিয়ে জহরই প্রথম দেখতে পেল জুলি কাকিমাকে।

এ গলির দু' পাশে সব ছোট ছোট একতলা বাড়ি। পাড়া প্রতিবেশীরা উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছে। দেখবারই মতন যে। এমন রূপবান পুরুষ ও সুস্নিগ্ধ রমণী এ পল্লীতে তো কখনও আসে না। শুধু সিনেমার পর্দাতেই দেখা যায়।

প্রশান্ত বসু আজ পরেছেন কোঁচানো ধুতি ও মুগার পাঞ্জাবি। অত্যন্ত গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় পুরুষ, তাঁর মুখে-চোখে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। আর জুলির সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি অনুভব করা যায় তাঁর কোমলতা।

প্রশান্ত বসু বললেন, এই দেখো জহর, কেমন ঠিক চিনে চিনে চলে এলাম। তুমি তো আসতে বলোনি। বটুদা কোথায়?

দীনেশ এই সময়টায় বাথরুমে। খবরের কাগজ সঙ্গে নিয়ে যান, অনেক সময় লাগে। আজ রবিবার বলে জহরের কোনও তাড়া নেই। এক চিলতে উঠোনের এক পাশে বাথরুম, দরজাটা টিনের। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কারও হিসু পেয়ে গেলে টিনের দরজায় থাবড়া মেরে মেরে নাকি সুরে বলে, বেরোও, ও দাদু, তাড়াতাড়ি বেরোও। আর কতক্ষণ হাগবে?

উঠোনে ধপাস ধপাস করে কাপড় কাচছে শান্তা। ব্লাউজ পরেনি, বুকে শুধু ব্রা, ভিজে যাবে বলে তার শাড়ি উরু পর্যন্ত গোটানো। জহরের অঙ্গে যথারীতি তার ছুটির দিনের পরিধান, লুঙ্গি ও ছেঁড়া গেঞ্জি।

এক এক সময় অত্যন্ত প্রিয়জনকে দেখলেও আঁতকে উঠতে হয়। জহরের এখন সেই রকম অবস্থা। কাকা-কাকিমাকে এখন সে বসাবে কোথায়? আগে থেকে খবর দিয়ে এলেও না হয় কিছুটা সাফ-সুতরো করে রাখা যেত।

দীনেশের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় এই বাড়ি তৈরি হয়েছিল, তাতেও কুলোয়নি, দিদি ও বড় জামাইবাবু কিছু টাকা দিয়েছিলেন। ওরা মাঝে মাঝে এসে থেকে যান কয়েকদিন। একটা ঘরে ওঁদের কিছু জিনিসপত্রও রয়েছে। কিছুদিন আগে বড় জামাইবাবুর সঙ্গে জহরের খানিকটা মন কষাকষি হওয়ায়, তিনি যাবার সময় সেই ঘরটায় তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে চলে গেছেন। প্রশান্ত কাকাদের দেখে প্রথমেই বড় জামাইবাবুর ওপর অসম্ভব রাগ হল জহরের। এমন চশমখোর, ঘরটা ব্যবহার করতেও দেবে না!

বাবার ঘরটা যেমন ছোট, তেমন নোংরা। চতুর্দিকে নস্যির দাগ। জহরদের শোবার ঘরটা বড় হলেও ছুটির দিনে শান্তা বিছানা পাট করে অনেক দেরিতে। খুবই অগোছালো অবস্থা, বড় ছেলেটা সেখানে বসেই পড়ছে। বসবার ঘর বলে আলাদা কিছু নেই। রাস্তার দিকে বারান্দায় দুটি চেয়ার পাতা, কোনও লোক এলে জহর এখানে বসেই কথাবার্তা সেরে নেয়।

কিন্তু এই দুই সম্ভ্রান্ত অতিথিকে তো বারান্দায় বসানো যায় না। রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে, ওপাশের বাড়ি থেকে হাঁ করে চেয়ে আছে কয়েকজন।

বাড়িটা লম্বাটে, সদর দরজা থেকে একটা সরু বারান্দা চলে গেছে রান্নাঘর পর্যন্ত, তারই এক পাশে উঠোন, অন্য পাশে পর পর তিনটি ঘর। সঙ্কোচে বিহ্বল হয়ে জহর অভ্যর্থনা জানাতেও ভুলে গেল, প্রশান্ত আর জুলি ঢুকে এলেন ভেতরে।

শান্তা ভূত দেখার মতন ভয় পেয়ে দৌড়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

জুলি বললেন, আমরা বোধহয় অসময়ে এসে পড়েছি।

সকাল প্রায় দশটা। মোটেই অসময় বলা চলে না। বিশেষভাবে মান্য করার মতন কোনও অতিথিই তো আসে না এ বাড়িতে।

প্রশান্ত বললেন, তোমার ছেলে মেয়ে কোথায়?

বাচ্চাদের তো সাজ-পোশাকের বালাই নেই, তাদেরই ডাকা হল প্রথমে। খোকনের বয়েস সবে সাত পেরিয়েছে, খুকি ছয়। খুকি ভদ্রগোছের ফ্রক পরা, পরিপাটি চুল আঁচড়ানো, খোকন শুধু প্যান্ট পরা, খালি গা, তার চুল আঁচড়ানো-না আঁচড়ানোয় কিছু যায় আসে না। কিছু বলতে হল না, তারা টিপ টিপ করে প্রণাম করল দু'জনকে।

জুলি খুকির গাল টিপে দিয়ে বললেন, কী মিষ্টি মুখখানা।

প্রশান্তর হাতে একটা বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ, তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে

তিনি গোটা চারেক চকলেট বার তুলে আনলেন।

দিতে না দিতেই খোকন আর খুকি একবার পরস্পরের হাতের দিকে চেয়ে দেখল, কে বেশি পেয়েছে, তক্ষুনি খাওয়া শুরু করে দিল।

এবারে বাথরুমের দরজা ঝ্যানঝ্যান শব্দ করে ঠেলে বেরুলেন দীনেশ। লুঙ্গিতে আলগা গিঁট, কোমরের নীচে নেমে গেছে, বুকে সাদা লোম ভর্তি খালি গা, মুখে নিমের দাঁতন।

প্রশান্ত আর দীনেশ দুই আপন মাসতুতো ভাই, অথচ দু' জনের চেহারায় কত তফাত! বয়েসের ব্যবধান বেশি নয়, তবু দীনেশ অনেক বুড়িয়ে গেছেন, বুকের খাঁচাটা স্পষ্ট দেখা যায়, খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটেন, বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলেন প্রায়ই। প্রশান্তর তুলনায় জীবনের পরিপূর্ণতার সিকিভাগও তিনি পাননি।

একমাত্র তিনিই এই দম্পতিকে দেখে লজ্জা পেলেন না।

দাঁতনটা ছুড়ে ফেলে, মুখ না ধুয়েই তিনি প্রায় ছুটে এসে, বাপি এসেছিস বলে জড়িয়ে ধরলেন প্রশান্তকে।

সদ্য পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে এই অবস্থায় যে প্রশান্ত আলিঙ্গনে অভ্যস্ত নন, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

জুলি কিন্তু, কেমন আছেন দাদা, বলে নিচু হয়ে প্রণাম করল দীনেশকে।

দীনেশ ছেলেকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, এদের দাঁড় করিয়ে রেখেছিস, বসাসনি?

তিনিও একবার তালাবন্ধ ঘরটার দিকে দৃষ্টিপাত করে সম্ভবত মুণ্ডপাত করলেন বড় জামাইয়ের।

তারপর বললেন, আয়, আমার ঘরেই বসবি আয়!

আর কোনও দিকে কোনও মিল নেই, শুধুমাত্র আত্মীয়তার জোরেই এ রকম একজন সম্ভ্রান্ত লোককে তুই সম্বোধন করতে পারেন দীনেশ।

বাবার ঘরে একমাত্র চৌকি ছাড়া আর বসবার কিছু নেই, তাই জহর দৌড়ে বারান্দা থেকে চেয়ার দুটো আনতে গেল।

ফেরার সময় নিজের ঘরে উঁকি মেরে শান্তাকে বলল, কী করছ, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো!

ঘরে ঢুকেও দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রশান্ত আর জুলি, জহরের আনা চেয়ারে বসলেন।

দীনেশ বললেন, গরিব দাদার বাড়িতে এসেছিস, বড় আনন্দ হচ্ছে, বড় আনন্দ হচ্ছে। বউমাকে তো সেদিনই দমদমে প্রথম দেখলাম। আহা কী লক্ষ্মীশ্রী মাখানো মুখ। আমার বউটা তো অনেক আগেই ফাঁকি দিয়ে সরে

পড়ল এবার আমিও গেলেই হয়। শরীর ভাল যাচ্ছে না। যাক গে সে-সব কথা। তোরা কেমন আছিস বল।

প্রশান্ত বললেন, আমরা ভালই আছি। তোমার শরীরের কী হয়েছে? কোনও কমপ্লেইন আছে?

দীনেশ বললেন, হাজারটা কমপ্লেইন। ব্লাড শুগার বেশি, কিছু খেতে পারি না, ছেলের সংসারে হাত ধরা হয়ে আছি, হার্টটা আজকাল দুর্বল লাগে।

জহর তার বাবার দিকে তাকাল। ছেলের সংসারে হাত ধরা হয়ে আছি, মানে কী? জহর তার বাবাকে খেতে দেয় না?

দীনেশ জহরের চোখে চোখ ফেললেন না। আবার বললেন, সব সময় ডাক্তার দেখানোও হয় না, দেখাতে গেলেই তো এক গাদা খরচ। তুই বড় ডাক্তার, এসে পড়েছিস যখন, একবার আমার হার্টটা দেখে দিবি নাকি?

প্রশান্ত বললেন, আমি তো ব্যাগ আনিনি বটুদা। একবার আমার বাড়িতে এসো, তোমাকে তো বলেছিলাম, জহর মাঝে মাঝে যায়—

দীনেশ বললেন, হ্যাঁ, জহর যায়। ওর মুখে তোদের সব খবর শুনি। আমার যাওয়ার অনেক অসুবিধে, একা একা বেশি দূর চলা-ফেরায় সাহস পাই না। জহর অফিস থেকে চলে যায়, আমি আর কী করে যাব?

জুলি বলল, একদিন সবাই মিলে সকালবেলা আমাদের ওখানে চলে আসুন। ছুটির দিন দেখে...

দীনেশ বললেন, ছুটির দিনে জহর বেরোবে? হুঃ! তা ছাড়া বুড়ো বাবাকে নিয়ে কোন ছেলে বেড়াতে যায়? তাও যদি রোজগেরে বাবা হত—

ছেলের সম্পর্কে যে দীনেশের এত অভিযোগ আছে তা তো জহর আগে বোঝেনি। এখন বাবা শোনাবার লোক পেয়েছেন।

বাক্স থেকে বার করে সবচেয়ে ভাল শাড়িখানা পরে ফেলেছে শান্তা। মুখে খানিকটা ক্রিমও মেখে নিয়েছে নাকি এর মধ্যে?

শান্তা এসে প্রণাম করতেই জুলি তার থুতনি ধরে চুমো খেলেন।

তারপর বললেন, তোমার নাম জানি, শান্তা, এই প্রথম দেখলাম। জহরকে অনেকবার বলেছি, তোমাকে নিয়ে যেতে।

জহর বলল, আমিও অনেকবার বলেছি। ও যেতে চায় না।

শান্তা লাজুকভাবে বলল, যাব একদিন।

প্রশান্ত ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে এবার বার করলেন একটা শাড়ি।

দীনেশ বললেন, এ-সব আবার এনেছ কেন?

জুলি বললেন, বাঃ, প্রথমবার মুখ দেখে শাড়ি দিতে হয় না?

প্রশান্ত বললেন, তোমার জন্যেও একটা ধুতি এনেছি বটুদা।

ধুতিটা দেখে লোভে চকচক করে উঠল দীনেশের চোখ। মুখে অবশ্য বললেন, ওরে বাবা, এত ফাইন, দামি ধুতি, এ কি আমাকে মানাবে?

জুলি বললেন, জহরের জন্য অবশ্য কিছু আনা হয়নি।

দীনেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ওর জন্য আবার কী আনবে? ও তো প্রায়ই তোমাদের বাড়িতে অনেক ভাল ভাল জিনিস খেয়ে আসে। তোমরাও আজ এখানে দুটো ডাল-ভাত খেয়ে যাও। ও জহর, আজ বাড়িতে কী মাছ?

প্রশান্ত বলল, আজ তো খেতে পারব না বটুদা। আসলে ব্যারাকপুরে এন জি ও-দের একটা সেমিনার আছে বারোটার সময়, সেখানেই লাঞ্চের ব্যবস্থা। তাই ভাবলাম, গাড়ি নিয়েই আসছি যখন, তোমাদের বাড়িটাও ঘুরে যাই। জুলিরও ইচ্ছে ছিল।

দীনেশ বলল, ও মা, ভাত খাবি না? তাতে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তোর মনে আছে বাপি, আমার মা তোকে জোর করে খাওয়াতেন। আমার অনেকগুলো মাসি, তাদের মধ্যে তোর মাকেই বেশি ভালবাসতেন আমার মা। দুটি ভাত খেয়ে যা, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

প্রশান্ত তাকালেন জহরের দিকে।

জহরের একটুও ইচ্ছে নয় ওঁদের ভাত খাওয়ানোর। কোনও রকম ব্যবস্থা নেই, এ ভাবে খাওয়াতে গেলে অতিথিদের ওপর অত্যাচার করা হয়। রোজ বাজারে যায় না জহর, একজন মাছওয়ালা বাড়িতে মাছ দিয়ে যায়। আজ দিয়েছে, তেলাপিয়া, তা কেউ কোনও মান্যগণ্য অতিথিকে খাওয়ায়!

জুলি বললেন, আমরা চা খেতে পারি।

শান্তা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। জহরও সঙ্গে যেতে উদ্যত হতেই প্রশান্ত বললেন, তুমি যেয়ো না, আর কিছু না, শুধু চা।

দীনেশ চেঁচিয়ে বললেন, বউমা, আমাকেও দিয়ো!

বাবার কী আক্কেল! অতিথিদের চা দিলে শান্তা কি শ্বশুরকে বাদ দেবে? ও কথাটা বলার কী দরকার ছিল?

বাবার এর পরের কথাটা শুনে জহর একেবারে শিউরে উঠল।

দীনেশ খানিকটা অনুনয়ের সুরে বললেন, বাপি, তোমার সঙ্গে তো অনেক হোমরা-চোমরা লোকদের পরিচয় আছে। একটু চেষ্টা করে দেখো না, যদি জহরের জন্য একটা ভাল চাকরি জোগাড় করে দিতে পারো।

আমার ছেলে হয়ে একটা কারখানায় কাজ করে, লোকে বলে মিস্তিরি, আমরা যে ভদ্রলোক ছিলাম, একদিন লোকে ভুলেই যাবে। এখানে উন্নতির কোনও আশা নেই, সারা জীবন ঘষটাবে—

জহর আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, বাবাঃ।

তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে দীনেশ বলে চললেন, কোনও একটা অফিস-টফিসে যদি ঢুকিয়ে দিতে পারো, তোমার কথা কেউ ফেলতে পারবে না। তোমাদের মিলিটারি অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে তো বাইরের লোক নেয়, অনেক ওভারটাইম দেয় শুনেছি—

প্রশান্ত অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমি তো রিটায়ার করেছি অনেকদিন।

জহর বলল, না, না, কাকা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি যে চাকরি করি, সেটা আমার বেশ ভাল লাগে।

দীনেশ বললেন, তুই যে বলছিলি, তোদের কারখানায় কী সব গণ্ডগোল চলছে, লক আউট হতে পারে।

জহর ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, সে-সব মিটে গেছে!

জুলি একদৃষ্টিতে জহরের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি আর আমি একটা কাজ করতে পারি। ক'দিন ধরেই আমার মাথায় সেটা ঘুরছে। আমি তো শুধু শুধু বাড়িতেই বসে থাকি।

জহর জিজ্ঞেস করল, কী কাজ?

প্রশান্তও জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আবার কী করবে?

জুলি প্রথমে স্বামীকে বললেন, সেটা তোমাকে আগে জানানো হবে না। জহরের সঙ্গে আমি খানিকটা তৈরি করে নিই

তারপর জহরকে বললেন, শিগগিরই একদিন এসো থিয়েটার রোডে, আলাদা বসে কথা বলব।

এরই মধ্যে খোকনকে দোকানে পাঠিয়ে শান্তা শিঙাড়া আর লবঙ্গলতিকা আনিয়েছে। একটা থালায় করে এনেছে চায়ের কাপ।

জুলি কাকিমাদের বাড়িতে কত রকম কাপ-প্লেট, প্রত্যেকদিন নতুন নতুন ডিজাইনের, সবগুলোই মনে হয় নতুনের মতন। পাতলা, স্বচ্ছ, স্বপ্ন স্বপ্ন রং।

শান্তা যে চারটে কাপ এনেছে, তার মধ্যে দুটোরই কানা ভাঙা। জুলি কাকিমারা কি এ রকম কাপে জীবনে কখনও চা খেয়েছেন? খুব দামি কাপ কেনার সামর্থ্য না থাকলেও ভাঙা কাপগুলো ফেলে দিয়ে শস্তার কয়েকটা কাপ কি কেনা যেত না? আসলে সে মানসিকতাটাই নেই, এই দিয়েই তো চলে যাচ্ছে, এ রকম একটা ভাব।

শিঙাড়াগুলো একেবারে ঠাণ্ডা, এমনকী কালকেরও বাসি হতে পারে। পাড়ার দোকানে প্রায়ই বাসি জিনিস গছায়, খোকনের মতন ছেলেমানুষ দেখলে আরও মজা পায়। আর লবঙ্গলতিকা মানেই তো ভেতরে ভুষিমাল। জহর নিজে ওটা কক্ষনও খায় না।

এ-সব আবার কেন আনলে, এই বলে ক্ষীণ আপত্তি জানালেও প্রশান্ত ও জুলি দু'জনেই শিঙাড়া-লবঙ্গলতিকা থেকে খানিকটা খানিকটা ভেঙে মুখে দিলেন। কাপের অবস্থা যেন লক্ষই করলেন না, পুরো চা শেষ করে বললেন, বাঃ ভাল হয়েছে বেশ।

মোট এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট থেকে, ভদ্রতায় ও মধুর ব্যবহারে সবাইকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়ে গেলেন এই দম্পতি।

ওঁদের গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেই জহর বাবার সামনে এসে ফেটে পড়ল, এর আগে সে কখনও বাবার সঙ্গে এমন ভাবে ঝগড়া করেনি।

—বাবা, তুমি ও রকম হ্যাংলার মতন কথা বলতে লাগলে কেন ওদের সঙ্গে? আমার চাকরি নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে কে বলেছে?

—বাঃ, মাথা ঘামাব না? সারা জীবন ওই রকম একটা বাজে চাকরি নিয়ে পড়ে থাকবি?

—আমার চাকরি মোটেই বাজে নয়। আমার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। তোমাদের খাওয়া-পরায় কিছু কম পড়েছে? আমি নিজের চেষ্টায় এ চাকরি জোগাড় করেছি, কারও হাত পায়ে ধরতে হয়নি।

—তা বলে আত্মীয়-স্বজনকে কি বলা যায় না?

—আত্মীয়-স্বজনকেই বরং বলা যায় না। বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন, তখন ওই সব কথা বলা মোটেই ভদ্রতা নয়।

—তুই আমাকে ভদ্রতা শেখাতে আসিস না টুকুন।

—নিশ্চয়ই শেখাব! তুমি বললে, লোকে আমাকে মিস্তিরি বলে, হ্যাঁ, আমি মিস্তিরিই, সে জন্য আমার কোনও লজ্জা নেই। মিস্তিরি হলে বুঝি ভদ্র হতে পারে না? কুলি-মজুরও ভদ্র হতে পারে।

—আমি বরাবর ইস্কুলে পড়িয়েছি, লোকের কাছে মান-সম্মান ছিল।

—নিজের ব্যবহারে মান-সম্মান আদায় করে নিতে হয়। ইস্কুল মাস্টারও যদি লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাকে কেউ মান সম্মান করে না।

—তুই আমাকে ঠেস দিয়ে কথা বলছিস? আমি লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি?

—লোকের সামনে হ্যাংলামি দেখালে মান সম্মান থাকে না।

—তুই সব সময় আমায় ঠেস দিয়ে কথা বলিস। দু' বেলা দুটো খেতে দিস বলে? প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব টাকা দিয়ে কী ভুল করেছি! এখন তোরা তাড়িয়ে দিলে আমাকে পথে পথে ভিক্ষে করে খেতে হবে।

—বাবা!

—ছেলের সংসারে অন্নদাস হয়ে থাকা, তার থেকে আর...... নিজস্ব সাধ আহ্লাদ বলতে আর কিছু নেই। কতটুকুই বা ভাত খাই...

শান্তা এর মধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, বাবা, আপনি এই কথা বলছেন? আপনার ডায়াবিটিস, সেই জন্য ভাত কম খাওয়ার কথা..... আপনি যে দিনের মধ্যে পাঁচ-ছ' কাপ চা খান, কখনও দিতে আপত্তি করেছি?

দীনেশ মুখ বিকৃত করে বললেন, চা না গোরুর পেচ্ছাপ, তা বোঝা যায় না। তাও যদি ভাল মনে দিতে। প্রত্যেকবার চা দেবার সময় মুখখানা বেগুন ভাজার মতন করে রাখো। আমি চিনি খাই না, ট্যাবলেট ফুরিয়ে গেলেও কেউ গ্রাহ্যি করে না! দোকানদারের মেয়ে, গুরুজনদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয়, তা তো শেখোনি!

শান্তা বলল, আপনি আমাকে যা ইচ্ছে বলুন, আমার বাবার নামে কিছু বলতে পারবেন না। আমার বাবা দোকানদার, তা জেনেশুনেই তো বিয়ে দিয়েছিলেন।

জহর বলল, কে মিস্তিরি, কে দোকানদার, এই দিয়ে মানুষের বিচার হয় না।

দীনেশ গলা চড়িয়ে বললেন, তুই বউয়ের পক্ষ নিয়ে এখন বাপকে ঠুকছিস। জরু-কা-গোলাম আর কাকে বলে। যুগটাই এই! আমাদের আমলে বউ যদি শ্বশুরের মুখে মুখে কথা বলত, তাকে চাবুক পেটা করতাম! এরপর কোন দিন বস্তির লোকের মতন বউয়ের কথা শুনে আমাকে মারবি, তাই না?

—বাবা, তুমি এমন কুৎসিত কথা...

জহর হঠাৎ থেমে গেল। বাবার সঙ্গে সঙ্গে তারও গলায় আওয়াজ চড়ে গেছে। এ কী করছে সে? ছেলেমেয়ে দুটো সব শুনছে।

শান্তার হাত ধরে টেনে সে ধমক দিয়ে বলল, তুমি রান্নাঘরে যাও!

তারপর দীনেশের দিকে ফিরে নিচু গলায় বলল, কথায় কথা বাড়ে। এক সময় মানুষের জ্ঞান থাকে না, অনেক খারাপ কথা এসে যায়। আমি ক্ষমা চাইছি, বাবা। কথা দিচ্ছি, এ বাড়িতে কোনওদিন তোমার কোনও অসম্মান হবে না।

দীনেশের মুখে নিষ্ঠুর হাসি। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আজ ক্ষমা চাইবি, কালই আবার ভুলে যাবি, জানি না আমি!

এত তাড়াতাড়ি ঝগড়া থেমে যাওয়া দীনেশের পছন্দ হয়নি। মাঝে মাঝে এই ধরনের ঝগড়া তিনি বেশ উপভোগ করেন। চেঁচিয়ে কথা বলার সময় শিরায় শিরায় উত্তেজনা বোধ হয়, বয়েসটাও যেন কমে যায়।

আগে ঝগড়া হলেই তিনি ভয় দেখাতেন, এ বাড়ি ছেড়ে বড় মেয়ের কাছে গিয়ে থাকবেন। এখন বড় জামাইয়ের ব্যবহার বদলে যাওয়ায় সে সম্ভাবনা আর নেই অবশ্য।

নিজের ঘরে এসে জহর সিগারেট ধরাল। ভেতরটা এখনও গজরাচ্ছে। নিজের ওপরেও সে রেগে গেছে বেশ।

দীনেশ বললেন, ছেলে একদিন বাপের গায়েও হাত তুলবে। বাবা কি সত্যিই জহরকে সে রকম মনে করেন, জহরের পক্ষে এটা সম্ভব?

গরিব হলেও মানুষ ভদ্র, সভ্য হতে পারবে না কেন?

জুলি কাকিমাদের বাড়িতে অন্য ধরনের লোকদের সংস্পর্শে এসে জহরের বারবার মনে হয়, তার বাড়ির পরিবেশটা বদলাতে হবে। শুধু চাকরি-বাকরি, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বেঁচে থাকাটাই সব নয়, গান-বাজনা, কবিতা, থিয়েটার, বিজ্ঞানের অগ্রগতি জানা, এ-সব না হলে জীবন পরিপূর্ণ হয় না। এইসব কিছুতে শুধু সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরই অধিকার?

সমাজের উচ্চস্তরে ওঠার একটা রাস্তা অখিল দেখিয়েছিল। সে রাস্তা নিতে পারবে না জহর। মদ খাওয়া, অন্যদের দেখাবার জন্য মদের আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দেওয়া, মিথ্যে কথা বলা, এমনকী স্মাগলারদের সঙ্গেও পরিচয় রাখা, না, ও-সব জহরের ধাতুতে নেই।

হঠাৎ এ সংসার ছেড়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়?

কোনওক্রমে সে নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। আবার সে শুরু করবে পড়াশুনো। প্রাইভেটে এম. এসসি পড়া যায় না, কোথাও রাত্তিরে ক্লাস হয় কিনা খোঁজ নিতে হবে। আরও বিজ্ঞান পড়বে, রিসার্চ করবে, সে অন্য জগতে চলে যাবে। এই মফস্বলের নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনযাত্রা তার সহ্য হচ্ছে না আর। অখিল যে সিঁড়ির কথা বলেছিল, সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠবে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির জগতে ওপরে উঠতে চায়।

শান্তা, ছেলে-মেয়ে আর বাবার কী হবে। ওরা চালিয়ে নেবে ঠিকই। জহর যদি কালই হঠাৎ মারা যায়, সেটা অসম্ভব কিছু নয়, ট্রেনে কাটা পড়তে পারে, দু' দল গুণ্ডার মারামারির মাঝখানে পড়ে গুলি খেয়ে মরতে পারে, এরকম তো প্রায়ই হয়। তখন কি এরা ভেসে যাবে? জাহাজ ডুবে

গেলে বাঁচার আশা থাকে না, কিন্তু ডাঙায় থাকলে মানুষ কোনও রকমে ঠিকই বেঁচে থাকে।

কিন্তু মরা আর না-মরার মধ্যে যে অনেক তফাত! মরে গেলে তো জহরের সব অনুভূতিও ফুরিয়ে গেল। কিন্তু বেঁচে থাকলে জহর ছেলে-মেয়ের কথা ভুলবে কী করে? ছোট মেয়েটা একটু আছাড় খেয়ে পড়লেই তার বুক টনটন করে। খোকনও রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়লেও এক একবার চোখ মেলে বলে, বাবা ফিরেছে? শান্তা সম্পর্কেও মায়া আছে। এমনকী বাবার ব্যবহারে অনেক সময় বিরক্ত হলেও, যখন সে ছোট ছিল, দিদিদের তুলনায় বাবা যে তাকে নিয়ে কত আদিখ্যেতা করতেন, তা কি জহর ভুলতে পারে?

না, জহর এই পরিবারের দায়িত্ব এড়িয়ে পালাতে পারবে না।

কিন্তু চাকরিটা বজায় রেখে, এই বাড়িতে থেকেও কি নানা রকম ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠা যায় না? দেখতে হবে যে ছেলেমেয়ে দুটো যেন খারাপ ভাষা না শেখে। ওদের শেখাতে হবে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। হঠাৎ যেন জহর কল্পনায় দেখতে পায়, তার মেয়ে খুকি এম. এসসি পাশ করে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করছে। আর খোকন হয়েছে ডাক্তার।...যদি আধপেটা খেয়েও থাকতে হয়, তবু জহর ছেলেমেয়েদের পড়াবে শেষ পর্যন্ত।

রাত্তিরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর জহরের হঠাৎ মনে পড়ায় সে সঞ্চয়িতা বইটা খুলে নিয়ে বসল। অন্যান্য দিনের মতন টিভিতে নেশার মতন সিরিয়াল দেখে যাচ্ছিল, বন্ধ করে দিল সেটা।

শান্তা রান্নাঘরের কাজ সারার ফাঁকে ফাঁকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে টিভি দেখে, আজ অন্যরকম দেখে সে জিজ্ঞেস করল, বন্ধ করে দিলে কেন?

উত্তর না দিয়ে জহর থেমে থেমে পড়তে লাগল :

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম।
ফালগুন রাতে দক্ষিণবায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা চাই তাহা পাই না....

শান্তা ফিক করে হেসে মুখস্ত বলতে লাগল :

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া

আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।
বাহু মেলি তারে বক্ষ লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা চাই তাহা পাই না।

বিস্ময়ে জহরের চক্ষু দুটি ঠিকরে আসার উপক্রম। বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে আস্তে আস্তে বলল, তুমি পড়েছ? তুমি এই কবিতা জানো?

ভ্রূভঙ্গি করে শান্তা বলল, কেন, দোকানদারের মেয়ে হলে বুঝি কবিতা পড়া যায় না? আমি আর দিদি অনেক কবিতা পড়তাম। দিদিই আমাকে শিখিয়েছিল।

জহর বলল, আমি তো ইস্কুল মাস্টারের ছেলে হয়েও কখনও এ-সব পড়িনি। কেউ পড়তে শেখায়নি। তুমি আমাকে আগে বলোনি তো?

শান্তা এবার অদ্ভুত একটা উদাসীন সুরে বলল, তুমি কোনওদিন জানতে চেয়েছ? রান্না, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ছেলেমেয়ের দেখাশুনো করা, শুধু এইসব নিয়েই তো আমাদের থাকতে হয়, অন্য কিছুর কথা ভাবতে নেই।

জহর বলল, আমি নিজেই তো গোমূর্খ। চাকরি ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবিইনি।

শান্তা জিজ্ঞেস করল, এখন হঠাৎ ভাবতে শুরু করলে যে? জুলি কাকিমাদের ওখানে গিয়ে বুঝি শিখেছ? ওখানে অনেক মেয়ে আসে, তাই না? কলকাতায় মেয়েরা কত কিছু করে। বিয়ের পরেও নাচে, গান গায়।

জহর বলল, তুমি আর কী কবিতা জানো, বলো তো?

শান্তা বলল, বিয়ের পর যখন এ বাড়িতে আসি, আমার বয়েস তখন সতেরো পেরিয়েছে, কী ভয় করছিল, কান্নাও পাচ্ছিল, কেন যেন মনে হচ্ছিল, তোমার দিদিরা আমাকে পছন্দ করেনি, আমি খুব রোগা, কিন্তু তুমি আমায় দেখতে গিয়েছিলে, তুমি পছন্দ করেছিলে, এ বাড়িতে তুমি আমার সবচেয়ে আপন, তখন আমি মনে মনে বলছিলাম :

ওগো বর, ওগো বঁধু
এই যে নবীনা, বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রসাদে একেলা

কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার
খেলিবার ধন শুধু
ওগো বর, ওগো বঁধু।....

এমন মায়া হল জহরের, সে দ্রুত উঠে এসে শান্তার দু' কাঁধ ধরে বলল, বিয়ের পর প্রথম প্রথম প্রত্যেক রাত্তিরে তুমি কাঁদতে। তখন ভেবেছিলাম, বাবা-মায়ের জন্য তোমার মন কেমন করছে। তুমি যে ভয় পেয়েছিলে, তখন বুঝিনি।

অনেকদিন পর শান্তা স্বামীর বুকে মুখ রেখে আবার কাঁদল।

এক মিনিটও নয়, তারপরই ছিটকে সরে গিয়ে বলল, বাবা বারান্দায় বসে আছেন। এখনও রাগ করে আছেন, তুমি ভেতরে নিয়ে এসো। বেশিক্ষণ বসে থাকলে ওঁর ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

জহর বলল, শান্তা, এখন থেকে রোজ শুতে যাবার আগে কিছুক্ষণ আমরা এইসব কবিতা পড়ব। ছেলেমেয়ে দুটোকেও শেখাতে হবে।

ছয়

বেস্পতিবার সকালে, জহর তখনও বাথরুমে। অফিসের সময় হয়ে গেছে, এখন তার জন্য সবাই বাথরুম খালি রাখে। শান্তা রান্নাঘরে খুব ব্যস্ত, জহর বেরিয়েই খেতে বসবে। অফিসের ক্যান্টিনে লাঞ্চ খাওয়া যায়, জহর সেখানে খায় না, সে টিফিনও নিয়ে যায় না।

দীনেশ টিনের দরজায় দুমদাম আওয়াজ করতে করতে বললেন, টুকুন, শিগগির বেরো। শিগগির!

বুড়ো মানুষ, যখন তখন বেগ পেতে পারে, তখন আর কে কী বলবে সে জ্ঞান থাকে না। কিন্তু দীনেশের গলার আওয়াজ এখন সে রকম নয়।

জহর মাথায় গামছা ঘষতে ঘষতে বেরুতেই দীনেশ বললেন, ওরে টুকুন, কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড, দ্যাখ, দ্যাখ, কাগজে কী লিখেছে!

কোনও অন্য রাজ্যের মন্ত্রীর ছেলে নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে ধরা পড়লে কিংবা বহু বছর পেনশনের জন্য অপেক্ষা করে কোনও শিক্ষকের আত্মহত্যার খবর বেরুলেও দীনেশ এরকম উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তাই জহর প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি।

দীনেশ বিহ্বলভাবে ছেলের হাতে কাগজটা তুলে দিলেন।

খবর প্রথম পাতাতেই। শিরোনাম এবং দু' এক লাইন পড়ামাত্র জহরের

শরীরে যেন প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক লাগল।

অনেক সময় চোখের সামনে জ্বলন্ত সত্যকে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। বাস্তবকে মনে হয় অবাস্তব। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবী একজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

থিয়েটার রোডে 'সোনার তরী' নামে বহুতল বাড়ির এক ফ্ল্যাটে খুন হয়েছেন এক সম্ভ্রান্ত গৃহবধূ। তাঁর নাম বিজলি বসু, জুলি নামেই বেশি পরিচিতা, তাঁর স্বামী সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রশান্ত বসু, গতকাল রাত সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে, এক বা একাধিক আততায়ী মহিলার শ্বাসরোধ করে—

নাম, ঠিকানা, সবই মিলে যাচ্ছে, তবু জহর দু'বার বলে উঠল, হতেই পারে না, হতেই পারে না।

ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘোরানো যায়, কিন্তু তাতে সময় বদলায় না। তীব্রতম অস্বীকারেও মুছে ফেলা যায় না কোনও নির্মম সত্যকে। জুলি কাকিমা বেঁচে নেই, তিনি খুন হয়েছেন।

গতকাল রাত সাড়ে আটটায় এটা ঘটেছে, এর মধ্যে কেউ খবর দেয়নি জহরকে! কী করে দেবে, তার বাড়িতে তো টেলিফোন নেই। কাল জহর অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে সাড়ে সাতটার মধ্যে। তারপর ট্রেনে চেপে কে তাকে খবর দিতে আসবে?

খাওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। আর বাইশ মিনিট পরে একটা ট্রেন আছে, কোনও রকমে জামা-প্যান্ট গলিয়ে জহর ছুটল স্টেশনের দিকে।

প্ল্যাটফর্মে সে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বুঝতে পারছে না কী ঝড় বইছে তার মনের মধ্যে। জুলি কাকিমার মতন মানুষকে কেউ খুন করতে পারে? অথচ অসম্ভবও যে নয়, তাও জহর জানে। কলকাতার বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে বুড়ো-বুড়ি খুন হওয়ার খবর তো প্রায়ই কাগজে বেরোয়। এদের খুন করাই সবচেয়ে সহজ। উচ্চমধ্যবিত্ত বা ধনী, ছেলেমেয়েরা বিদেশে বা প্রবাসে থাকে, শুধু স্বামী-স্ত্রী, কখনও কখনও দু'জনও নয়, একজন, খুনে-বদমাশরা দূর থেকে কয়েকদিন নজর রাখে। জুলি কাকিমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে অনেকবার। উনি যে, সব মানুষকে বড় বেশি বিশ্বাস করেন। কাগজে লিখেছে, দরজা ভাঙেনি, আততায়ীরা সম্ভবত পরিচিত, জুলি নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তাঁর স্বামী কিংবা কাজের মহিলাটি কেউই তখন ফ্ল্যাটে ছিল না।

ট্রেন লেট করছে, ট্রেন লেট করছে। এক একদিন ট্রেন বেশি লেট করলে ক্রুদ্ধ অফিসযাত্রীরা স্টেশনমাস্টারের ঘর ভাঙচুর করে, জহর

কখনও সে দলে যোগ দেয়নি। আজ তার ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে স্টেশনমাস্টারের টুটি চেপে ধরতে। সে গেল না অবশ্য। এতক্ষণ জহর কাঁদেনি এখন একটি লোকাল ট্রেনের ওপর অভিমানে তার চোখে জল এসে গেল!

দয়া করে ট্রেনটি এসে পড়ল আরও আঠারো মিনিট পরে। রুমাল আনা হয়নি, অনবরত জামার হাতায় চোখ মুছছে জহর।

পুলিশ টের পেয়েছিল গতকাল রাত দশটার মধ্যেই। সেখান থেকেই সাংবাদিকরা খবর জেনেছে। আজ সকালেও পুলিশ এসেছে, ফ্ল্যাটের সামনে ভিড় করে আছে একগাদা লোক। অধিকাংশ মানুষই গল্প শুনতে ভালবাসে। একজন পুরুষের চেয়েও একজন মহিলার মৃত্যু সম্পর্কে কৌতূহল অনেক বেশি, সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। শুধু খুন না সেই সঙ্গে ধর্ষণ? টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি নেয়নি? কত লক্ষ কালো টাকা লুকোনো ছিল? স্বামীটাই খুন করেনি তো?

ওই ভিড়ের জনগণ নিজেরাই এক-একটা তত্ত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছে।

জহরকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না দরজার সেপাই। বেশি যুক্তি-তর্কের মধ্যে না গিয়ে সে প্রায় জোর করে তাকে ঠেলে চলে এল ভেতরে। তার চোখ এখন শুকনো।

বসবার ঘরের মেঝেতে জুলির শরীর একটি সাদা চাদরে ঢাকা। চার পাশে খড়ির দাগ। রক্তের চিহ্ন নেই কোথাও। একজন ক্যামেরাম্যান ফ্ল্যাশে ছবি তুলছে দেওয়ালের। একজন পুলিশ অফিসার কথা বলছেন টেলিফোনে, আর একজন কোলে এক তাড়া কাগজ নিয়ে একটা একটা করে পড়ছেন, দেখলে মনে হল, সেগুলো চিঠিপত্র।

প্রশান্ত বসু পাথরের মূর্তির মতন বসে আছেন একটা সোফায়। প্যান্ট-শার্ট, মোজা সমেত সু পরা, কাল রাতে বাড়ি ফেরার পর আর পোশাক বদল করেননি। দৃষ্টি একেবারে স্থির।

তাঁর পেছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে শ্রেয়া, অনির্বাণ, রণবীর, অরিন্দম, বন্দনারা। জহরও চলে গেল ওদের পাশে। কেউ কোনও কথা বলছে না।

যিনি টেলিফোন করছেন, তিনি নবাগত জহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কৌতূহলের চোখে, একটু পরে ফোন নামিয়ে রেখে জহরের কাছে এসে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরিচয়?

জহর প্রশান্তর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, উনি আমার কাকা।

পুলিশ অফিসারটি ভেতরের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

বসবার ঘর ছাড়া অন্য কোনও ঘরে জহর কখনও ঢোকেনি। এ ঘরটা সম্ভবত ওঁদের কোনও মেয়ের। সব কিছু সাজানো, তবু মনে হয়, অনেকদিন ব্যবহার হয়নি।

দুটি চেয়ার এনে রাখা হয়েছে, জহরের মুখোমুখি বসে পুলিশ অফিসারটি একটি ছোট্ট খাতা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, আপন কাকা?

পরপর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে জহর তার পরিচয় জানাল।

—আপনি কখন এ খবর পেলেন?

—আজ সকালে।

—কে ফোন করেছিল?

—ফোন তো কেউ করেনি। খবরের কাগজ দেখে।

—আপনি এ বাড়িতে প্রায়ই আসেন, মানে কি রোজ, না ক'দিন অন্তর?

—তার কোনও ঠিক নেই। কখনও সপ্তাহে দু'বার, কখনও দু'সপ্তাহে একবার।

—শেষ কবে এসেছেন?

—গত বুধবার, না, না, বেস্পতিবার।

—মিসেস বোসকে তখনই শেষ দেখেছেন?

—না, তা নয়, পরেও দেখেছি। এই রবিবার।

—কোথায়?

—কাকা-কাকিমা দু'জনেই আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। নৈহাটির বাড়িতে।

—ও, এঁরা আপনাদের বাড়িতেও যেতেন। প্রায়ই যেতেন?

—না, এই একবারই

—কেন গিয়েছিলেন?

—দেখুন, আমার মনে হয়, তার সঙ্গে এই ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নেই।

খাতাটা বন্ধ করে অফিসারটি বললেন, দেখুন, অনেক সময় আমরা এমন প্রশ্ন করি, যা শুনলে মনে হয়, বোকার মতন কথা। কীসের সঙ্গে যে কীসের সম্পর্ক, তা তো আগে থেকে বলা যায় না। অনেকের কাছে আবোল তাবোল প্রশ্ন করতে করতে একটা ছবি তৈরি হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে। যেমন ধরুন, এঁদের কাজের লোক একটিই। একজন মাঝ বয়েসী মেয়েছেলে। তাকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন?

জহর বলল, মাস চারেক ধরে এখানে আসছি, ততদিনই চিনি।

—ওর ক'টি ছেলেমেয়ে তা জানেন?

—না তো। জিজ্ঞেস করিনি।

—তা হলে ওর একটি ছেলে যে রেল ডাকাতির কেসে জেল খেটেছে, সেটাও জানেন না নিশ্চয়ই?

—তাই নাকি?

—মিস্টার বোসও এ খবর জানতেন না। কিন্তু রণবীর ঘোষাল, ওই যে ভদ্রলোক গানটান করেন, তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তিনি এই মেয়েছেলেটিকে, কী যেন নাম, বেলা, হ্যাঁ বেলাকে অন্য এক বাড়িতে আগে কাজ করতে দেখেছেন। সেখান থেকে বেলার ওই জন্য চাকরি যায়।

—আমি এ-সব কিছুই আগে শুনিনি।

—কথায় কথায় এ-সব বেরিয়ে আসে। তা হলে এবার বলুন, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বোস নৈহাটিতে আপনাদের বাড়িতে হঠাৎ কেন গিয়েছিলেন?

—এমনিই। আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। আমার বাবা বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোন না। ওঁরা ব্যারাকপুরে একটা মিটিং-এ গিয়েছিলেন, সেইখান থেকে, বেশি তো দূর নয়

—তা হলে লাস্ট রবিবারই আপনি মিসেস বোসকে অ্যালাইভ দেখেছেন। সেদিন কি আপনার মনে হয়েছিল, এঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও ব্যাপারে টেনশান চলছে?

—একেবারেই না। এই দু'জনের মধ্যে আমি একদিনও একটুও কথা কাটাকাটি হতেও দেখিনি। আসলে জুলি কাকিমার টেমপারামেন্টই এমন ছিল, কক্ষনও একটা জোরে কথাও বলতেন না।

—যাঁরা জোরে কথা বলেন না, তাঁরা মনের মধ্যে সব কিছু চেপে রাখেন। একদিন হঠাৎ সেটা বার্স্ট করে। এঁদের জীবনে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি, সে মেয়ে হতে পারে, পুরুষ হতে পারে, এসে পড়েছিল কি? যাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টেনশান তৈরি হতে পারে?

—অসম্ভব। মানে, আমি কল্পনাও করতে পারি না। মানে, সেরকম কোনও চিহ্নই আমি কখনও দেখিনি। মানে, কী বলব, জুলিকাকিমার জীবনটা এমনই সুন্দর ছিল যে উনি এ ধরনের কোনও ব্যাপার—

—বুঝলাম, মিসেস বোসের ক্যারেকটার খুব পিয়োর ছিল। কিন্তু ডাক্তার বোসের ব্যাপারে কি আপনি অতটা শিয়র হতে পারেন? উনি যদি অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন?

—আমি, আমি, আমার এ ব্যাপারে কোনও ধারণাই নেই!

—এক একটা মার্ডারের পর কতরকম ব্যাপারই যে বেরিয়ে আসে,

মানুষের চরিত্রের এমন এমন দিক, যা তার চেনাশুনোরা কল্পনাও করতে পারে না। খুনের মোটিভটা জানাই আসল ব্যাপার। মার্ডার সাধারণত দু'রকমের হয়। মার্ডার অফ প্যাশান, আর মার্ডার ফর গেইন। অনেক সময় দুটো গুলিয়েও দেওয়া হয়, যাতে বুঝতে পারা না যায়। মিস্টার বোস বাড়িতে কত টাকা রাখতেন, জানেন?

—তা আমি জানব কী করে? টাকার কথা তো কখনও ওঠেনি।

—ডাক্তার বোস বলছেন, বাড়িতে, ওঁর স্ত্রী কাছে, স্ত্রীই সব টাকাকড়ি রাখতেন, ক্যাশ মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। পুরোটাই গেছে। আর গয়না গেছে দেড় লাখের মতন। আপাতত মনে হতে পারে, কোনও ক্রিমিনাল গ্যাং-এর কাজ, কিন্তু দরজা তো ভাঙেনি, মিসেস বোস নিজেই কি দরজা খুলে দিয়েছিলেন কোনও চেনা লোকের গলার আওয়াজ শুনে? অবশ্য, বেলা নামের ওই মেয়েলোকটি একটা নকল চাবি তৈরি করিয়ে বাইরে চালান দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ওই ধরনের ক্রিমিনালরা রাত্তির ন'টার সময় আসবে কেন? তারা আসে নির্জন দুপুরে কিংবা শেষ রাতে। কমপ্লিকেটেড, বুঝলেন, খুবই কমপ্লিকেটেড! অবশ্য ডাক্তার বোস যখন বাড়িতে থাকবেন না, সেই খবর নিয়েই ওরা আসবে, ডাক্তার বোসের রিভলভার আছে, আপনি জানতেন?

জহর অবোধের মতন দু' দিকে ঘাড় নাড়ল।

অফিসারটি বললেন, আপনাকে শুধু কিছু রুটিন কোয়েশ্চেন করলাম, এরপর যদি আপনার নতুন কিছু মনে পড়ে, যে-কোনও ছোটখাটো ঘটনা, আমাকে জানাবেন। আমার নাম সিরাজুল তারিখ, লালবাজারে আমাকে ফোন করবেন, ডোন্ট ফরগেট!

জহর আবার ফিরে এল বসবার ঘরে।

এখন আর সবাই একেবারে নীরব নয়।

রণবীর ফিসফিস করে বলছে, কী করে সে সবার আগে খবর পেয়েছে। বাড়ি ফিরে প্রশান্ত বসু এই দৃশ্য দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। কী ভাবে পুলিশকে খবর দিতে হবে, তা পর্যন্ত বুঝতে পারছিলেন না। টেলিফোন-খাতাটা উল্টে প্রথমেই রণবীরের নামটা দেখে তাকে ফোন করে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। গলায় কোনও উত্তেজনা ছিল না, কেমন যেন যান্ত্রিক ভাব, তিনি বলেছিলেন, মিস্টার ঘোষাল, এক্ষুনি একবার আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে পারবেন? যেখানে, যে-অবস্থায় আছেন, এক মিনিটও দেরি না করে। বিশ্বাস করুন, আমি সারাজীবনে কোনও মানুষকে এভাবে অনুরোধ করিনি। রণবীর বন্ধুদের

সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল, কিন্তু এই ধরনের অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। জোরে গাড়ি চালিয়ে, দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দেখে এই কাণ্ড! লালবাজারে অনেকের সঙ্গে রণবীরের চেনাশুনো আছে, সুতরাং খবর দিতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি।

জহর ভাবল, এই ধরনের কাজ অখিলকেই বেশি মানায়। কিন্তু অখিলকে তো দেখা যাচ্ছে না।

সে শ্রেয়াকে জিজ্ঞেস করল, অখিল এখনও খবর পায়নি?

শ্রেয়া বলল, এখান থেকেই ফোন করা হয়েছিল, কিন্তু অখিলবাবু কলকাতায় নেই, বাইরে কোথাও গেছেন।

ইস, অখিলের জন্য কষ্ট হল জহরের। বেচারি যখন শুনবে। অখিলের সঙ্গেই এ বাড়ির যোগাযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। আজই সে কলকাতার বাইরে চলে গেল?

সিরাজুল তারিখ প্রশান্ত বসুর সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। তিনিই কথা বলছেন বেশি, প্রশান্ত বসু শুধু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ-না বলে যাচ্ছেন। ডেড বডি তো পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যেতে হবেই। কাটা-ছেঁড়ার পর সেই বডি দেখা নিকট আত্মীয়দের পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক। ওঁদের ছোট মেয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে আসবে ইভনিং ফ্লাইটে, সে পর্যন্ত ডেড বডি এখানেই রেখে দেওয়া যেতে পারে। তবে কেউ যেন কিছু টাচ না করে।

ডেড বডি? জুলি কাকিমা আর নেই, শুধু ডেড বডি! জুলি কাকিমা কালও এই সময় বেঁচে ছিলেন, কেউ কি তাঁর কথা ভাবছে? পুলিশ এসে সকলের মধ্যে এমন একটা সন্দেহের আবহাওয়া তৈরি করে দেয় যে কেউ-ই অন্য কথা ভাবতে পারে না। জহরও পুলিশদের কথাই শুনছে সমস্ত মনোযোগ দিয়ে।

ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। বাজতেই লাগল। অন্য অফিসারটি ফোন তুলে, দু'একটা কথার পর, বললেন, একজন কেউ ডক্টর বোসকে চাইছে।

প্রশান্ত একটা হাত তুলে নাড়লেন, অর্থাৎ তিনি ফোন ধরবেন না।

জহরই ফোনের সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে, শ্রেয়া তাকে বলল, আপনিই কথা বলুন না।

জহর ফোন হাতে নিয়ে বলল, হ্যালো?

অন্যদিকে অখিলের গলা। সে বলল, কে? জহর নাকি? তুমি এ সময় ওখানে? কী ব্যাপার?

জহর শুকনো গলায় বলল, এই, মানে, এমনিই এসে পড়েছি।

—তুমি ওই বিল্ডিং-এ অন্য কোনও ফ্ল্যাটে কাজে এসেছিলে বুঝি? শোনো জহর, একটা বিশেষ দরকারে ফোন করছি।

—তুমি কোথা থেকে কথা বলছ, অখিল?

—আসানসোল থেকে।

—আসানসোল? কখন গেলে?

—আমি তো দিন তিনেক ধরে এখানেই।

—তিনদিন?

—হ্যাঁ, মঙ্গলবার থেকে। শোনো জহর, প্রশান্তদার সঙ্গে আমার খুব দরকারি কথা আছে। একবার ফোনটা দাও তো ওঁকে।

—ইয়ে, মানে, একটু অসুবিধে আছে।

—উনি বাথরুমে? তবু যদি ডেকে দাও, আমি খুব একটা মুশকিলে পড়ে গেছি। তোমাকেই আগে বলি, কী হয়েছে জানো, এখানে অটোয়ালদের হোটেলে উঠেছি, কাল আমার মানিব্যাগটা চুরি গেছে, তার মধ্যে টাকাপয়সা, ক্রেডিট কার্ড, আরও দরকারি কাগজপত্র সব গেছে! যাক গে, সে আমি এক রকম ম্যানেজ করে নেব। এখানে এসে শুনছি, পাঁচটা কয়লাখনি গ্রুপের জেনারাল ম্যানেজার সুদর্শন সিংহরায় আমাদের প্রশান্তদার খুব পরিচিত, বুঝলে? ওখানে আমার একটা খুব বড় অর্ডার পাবার সম্ভাবনা আছে। প্রশান্তদা যদি আমার একটা রেফারেন্স দিয়ে দেন, মানে, শুধু সুদর্শন সিংহরায়কে ফোন করে বলে দেবেন, উনি আমাকে ভাল চেনেন। ব্যস, এইটুকু। ওঁকে একটু ডাকো না ভাই, ফোনের অনেক বিল উঠে যাবে।

—অখিল, এখানে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে।

—অ্যাঁ? তার মানে? ও বাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল? আমি কতবার আলাদাভাবে ফায়ার ইন্সিয়োরেন্সের কথা বলেছি।

—না, তা নয়। জুলি কাকিমা—

—জুলি বউদির কী হয়েছে? অসুখ? হার্ট অ্যাটাক? এখন কোথায়, নার্সিংহোমে? এই জহর, তুই উত্তর দিচ্ছিস না যে? আমার সঙ্গে নখরাবাজি করছিস? কী হয়েছে, খুলে বল।

—অখিল, তুমি আজই চলে আসতে পারবে?

— টাকা-পয়সা, কার্ড ফার্ড সব হারিয়ে গেছে, হোটেলের বিল মেটাতে হবে, এক্ষুনি যাই কী করে? কী হয়েছে, ব্যাপারটা কী, কেন বলছিস না?

—জুলি কাকিমা, জুলি কাকিমা, আর নেই।

—অ্যাঁ?

মনে হল, অখিলের হাত থেকে ফোনটা খসে পড়ে গেছে। কিন্তু কাটেনি। শোনা যাচ্ছে, অখিলের একটা অদ্ভুত বুক চাপা আর্তনাদের মতন।

জহর মুখ তুলে অসহায়ের মতন শ্রেয়াকে বলল, আমি আর পারছি না, এবার যা বলার তুমিই বলো।

শ্রেয়া, শক্ত ধরনের মেয়ে। ভেঙে পড়বার কোনও চিহ্ন নেই। ফোনটা তুলে সে বলল, হ্যালো, হ্যালো, অখিলবাবু, যা শুনেছেন, ঠিকই শুনেছেন। সামথিং টেরিব্‌ল হ্যাজ হ্যাপেন্‌ড হিয়ার। আমরা সবাই এখানে আছি। আপনি যদি শেষ দেখা দেখতে চান, সন্ধের মধ্যে আসতে হবে।

সিরাজুল তারিখ ফটোগ্রাফারকে বললেন, বডির কয়েকটা ছবিও তুলে রাখুন ভাই।

সাদা চাদরটা সরিয়ে ফেলা হল।

জহর ভেবেছিল, সে আর মৃতদেহ দেখবে না, জুলি কাকিমার আগের চেহারাটাই মনে রাখবে। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৃষ্টি চলে গেল।

জুলি কাকিমার মুখের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। চোখ দুটি খোলা, তাতে অসম্ভব বিস্ময় ও বেদনা।

এর মধ্যেই জানা হয়ে গেছে, আততায়ীরা গুলি করেনি কিংবা ছুরি চালায়নি। খুব সম্ভবত অতর্কিতে গলা টিপে ধরেছে কিংবা মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কেড়ে নিয়েছে শেষ নিশ্বাস।

সারাদিন অনেকেই রয়ে গেল সেই ফ্ল্যাটে। শুধু রণবীরকে চলে যেতে হল, বহরমপুরে তার গানের প্রোগ্রাম আছে, টাকা নিয়ে ফেলেছে, যেতেই হবে। নইলে আজকাল উদ্যোক্তারা হামলা করে বাড়িতে এসে।

যাবার সময় রণবীর বলল, তবু এখানে এলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হত। আড্ডাটা ভেঙে গেল, আবার কবে দেখা হবে জানি না।

যতই দুঃখ হোক, শোকে বুকটা ভেঙে যাক, তবু শরীরের ছোটখাটো দাবি মেটাতেই হয়। হিসি করতে যেতে হয় না বাথরুমে? চায়ের তৃষ্ণা ঠিকই জানান দেয়। এমনকী দুপুরে খিদেও পায়।

প্রশান্ত আগের রাতে একটুও চোখের পাতা জোড়েনি, কিচ্ছু খায়নি। শ্রেয়া সব ভার নিয়ে নিল, দোকান থেকে চিনে খাবার আনাল, প্রশান্তকে জোর করে কিছু খাইয়ে শুতে পাঠিয়ে দিল বিছানায়।

বসবার ঘরের মাঝখানে পড়ে রইল জুলির নিস্পন্দ শরীর। তার পাশেই গ্যাঁট হয়ে বসে আছে একজন কনস্টেবল। সে ঘন ঘন বিড়ি ফুঁকছে।

খানিকবাদে অনেক বরফের চাঙাড় এনে চাপিয়ে দেওয়া হল মৃতদেহের

ওপর। জুলিকাকিমা নন, মৃতদেহ!

এরই মধ্যে খবর এল নানা রকম।

বেলার শরীর খারাপ বলে মাঝে মাঝেই ছুটি নিচ্ছিল ইদানীং। তার বাড়ি গাঙ্গুলিবাগানে। পুলিশ সেখানে গিয়ে তার দেখা পায়নি, সে নাকি চলে গেছে মুর্শিদাবাদে দেশের বাড়িতে।

সে এত বিশ্বস্ত ছিল, কোনও খবর না দিয়েই চলে গেল মুর্শিদাবাদ? সন্দেহ তো হতেই পারে।

কোনও লিফ্‌টম্যান রাত ন'টার সময় কাউকে এই ফ্ল্যাটে ঢুকতে বা বেরুতে দেখেনি। লিফ্‌টম্যানরা মাঝে মাঝেই লিফ্‌ট ছেড়ে চলে যায়। ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের ফাই-ফরমাশ খাটে। জুলি কাকিমাই তো ওদের দিয়ে কিছু কিছু জিনিস আনাতেন। যদিও একজন লিফ্‌টম্যান পুলিশের কাছে হলফ করে বলেছে, সে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত লিফ্‌ট ছেড়ে এক পাও নড়েনি। কাজে ফাঁকি দেবার কথা সে স্বীকার করবে কেন?

আততায়ীরা তো সিঁড়ি দিয়েও উঠে আসতে পারে।

এত বড় বাড়ির দু'দিকের দুটো দরজা সব সময় খোলা থাকে, অনবরত লোকজন আসা-যাওয়া করছে, গাড়ি ঢুকে আসে, ট্যাক্সি আসে, দারোয়ানদের পক্ষেও নজর রাখা সম্ভব নয়।

এয়ারপোর্টে ফোন করে জানা গেল, ব্যাঙ্গালোরের ফ্লাইট দু'ঘণ্টা লেট। অর্থাৎ নয়না রাত সাড়ে দশটার আগে পৌঁছতে পারবে না। জহর অতক্ষণ বসে থেকে কী করবে? তাকে তো বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়িতে খবর দেবার কোনও উপায় নেই।

জহর উঠে পড়ল।

এক একজন মানুষ চলে যাবার পর তার অস্তিত্বের কথা বেশি করে অনুভব করা যায়। এতক্ষণ পর, একা হয়ে গিয়ে জহর জুলি কাকিমার অভাব ঠিক মতন বুঝতে পারল। জুলি কাকিমাকে ঘিরে তার একটা অন্য জগৎ গড়ে উঠছিল, সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল!

সেই রবিবার সকালে জুলি কাকিমার সঙ্গে শেষ দেখা, তারপর এই ক'দিনের মধ্যে জহর আর আসতে পারেনি। অফিসে একটা ঝামেলা চলছে, স্ট্রাইক বোধহয় হবেই, ছুটির পর রোজই ইউনিয়নের মিটিং। তবু একটু রাত করেও তো জহর আসতে পারত, তা হলে জুলি কাকিমার সঙ্গে অন্তত আর একবার দেখা হত। জহরের নিজের গালে চড় মারার ইচ্ছে হল।

কালও যদি জহর আসত, তা হলে জুলি কাকিমা খুন হতেন না।

আশ্চর্য ব্যাপার, কাল কেউই আসেনি। অথচ, প্রতিদিনই কেউ না কেউ সন্ধেবেলা এসে জুলি কাকিমাকে সঙ্গ দেয়। অখিল না হয় কলকাতার বাইরে, শ্রেয়া, রণবীর, অরিন্দম-বন্দনা, সবাই একসঙ্গে অনুপস্থিত? খুনিরা কি দূর থেকে লক্ষ রেখেছিল? কিংবা, খুনিরা ওই বাড়িতেই থাকে?

জহরের ভুরুটা কুঁচকে গেল। কোথায় যেন কী একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিছু যেন একটা মিলছে না!

পুলিশ এবং আর সবাই খুনিরা, খুনিরা বলছে কেন? খুনি তো একজনও হতে পারে। পুলিশ কিছুটা ধস্তাধস্তির চিহ্ন পেয়েছে। ব্লাউজ ছেঁড়া, শাড়ি অনেকটা খোলা, তবে বলাৎকার হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা না করে বোঝা যাবে না। অনেক নরপশু পাঁচ বছরের মেয়ের ওপরেও বলাৎকার করে, পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধাদেরও ছাড়ে না। সেই তুলনায় জুলি বসু তো যথেষ্ট আকর্ষণীয়া ছিলেন!

সোফার সঙ্গে হেলান দেবার জন্য যে পিঠ-বালিশ থাকে, সেই রকম একটা বালিশ দিয়ে মুখ চেপে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছে। উঃ, সেই সময়টায় কত কষ্টই না পেয়েছেন জুলি কাকিমা! যিনি মানুষকে দুঃখ দিয়ে একটু বাঁকা কথাও বলতেন না কখনও, তাঁকে এই ভাবে...।

বাড়িতে ফিরে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না জহরের, কিন্তু দীনেশ সবকিছু খুঁটিয়ে শোনার জন্য ব্যগ্র, না-খেয়ে জেগে বসে আছেন।

জহরকে মোটামুটি একটা বিবরণ দিতেই হল। দীনেশ তাতে সন্তুষ্ট নন, কে কে এসেছিল, কে কী বলল, সব তাঁকে জানাতে হবে। এক সময় বিরক্ত হয়ে বাবাকে মৃদু ধমক দিয়ে ফেলল জহর।

তারপর তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল। শেষ সিগারেটটা পর্যন্ত ধরাল না। সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

কিন্তু ঘুম আসবে কেন? রাস্তায় অনেকগুলো কুকুর ডাকছে, ঝগড়ার সময় তাদের গলার আওয়াজ কী প্রচণ্ড বেড়ে যায়! থামছেই না। অন্যদিনও কুকুর ডাকে, রাত্তিরে বেশি শোনা যায়, তারই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে জহর। আজ কি বেশি বেশি ডাকছে?

খাটের ওপর শান্তা পাশ ফিরছে, বাচ্চারা নড়াচড়া করছে, তাও শুনতে পাচ্ছে জহর। অন্যদিন পায় না।

রবিবার এ বাড়িতে এসে জুলি কাকিমা বলেছিলেন, জহরের সঙ্গে তাঁর কিছু একটা কাজ আছে। দু'জনে মিলে কিছু করবেন। কী ভেবেছিলেন তিনি? সেটা শোনা হল না। জহরকে যেতে বলেছিলেন, নিরিবিলিতে কথা বলবেন, এই চারদিনের মধ্যে সে যেতে পারেনি। সে জন্য সারাজীবন কি

আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে?

কী ভেবেছিলেন জুলি কাকিমা? নতুন একটা কাজ। তাতে হয়তো জহরের জীবনটা বদলে যেতে পারত।

এরই মধ্যে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল জহরের চোখে। কোনও একটা কথার সঙ্গে এ দৃশ্যটা কিছুতেই মিলছে না। সে কি তবে ভুল দেখেছে? হতেও পারে, মাত্র দু'এক পলকের দেখা, একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের চেহারারও মিল থাকে।

হিংস্র চিৎকার করতে করতে কুকুরগুলো যেন একেবারে বাড়ির পাশে চলে এসেছে। এখানে ছাড়া আর ওরা কি ঝগড়া করার জায়গা পেল না? একবার ভাবল, উঠে গিয়ে লাঠি নিয়ে ওদের তাড়া করবে। কিন্তু এক সময় শরীর ভারী হয়ে আসে, উঠতে ইচ্ছে করে না।

হঠাৎ এক সময় জহরের ঘুম ভেঙে গেল। তার পাশে বসে আছে শান্তা। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

জহর জিজ্ঞেস করল, এ কী, তুমি ঘুমোওনি?

শান্তা খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে না গো?

জহর বলল, কই না তো!

শান্তা বলল, তুমি ঘুমের মধ্যে আঃ আঃ করছিলে! ঘুমোও, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, ঘুমোও!

সাত

অফিসের যা অবস্থা, এখন কামাই করলে ইউনিয়নের কোপে পড়তে হবে।

বেশির ভাগ ওয়ার্কারই এখন স্ট্রাইক চায় না, অথচ মালিকরাও এমন গোঁয়ার্তুমি করছে যে কিছু একটা ভয় না দেখালে তারা আরও পেয়ে বসবে। এই কম্পানির ওয়াটার পিউরিফায়ার মেশিনের এখন ভাল বাজার, অনেক লোকই এখন করপোরেশনের কলের জল খায় না, অফিস-ফ্যাক্টরিগুলোতে তো বটেই, বহু ফ্ল্যাটে এখন এই মেশিন ব্যবহার হয়। তা কম্পানির যদি বেশি লাভ হয়, কর্মচারীরা তো তার ভাগ চাইবেই।

দাবি খুব বেশি নয়, কম্পানির মালিকরাও খানিকটা দিতে রাজি আছে, শুধু মাঝখানে একটু আটকে আছে, ক্যান্টিনের শস্তা খাবারের ব্যাপার নিয়ে। এ যেন জেদাজেদির প্রশ্ন।

জহর ক্যান্টিনে খায় না, বাড়িতে যা খেয়ে আসে, তাই-ই যথেষ্ট। তবু

অন্যান্য কর্মীদের দাবি তাকে তো সমর্থন করতে হবেই। তার শুধু ভয় লক আউটের। তার মতন অনেকেরই এই ভয় আছে, মুখে প্রকাশ করে না। কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে মালিকদের কী এমন ক্ষতি, তাদের অনেক রকম প্রটেকশান আছে। অবাঙালি মালিক, তারা চলে যাবে অন্য রাজ্যে, জহরের মতন কর্মীদের অন্য কোথাও চাকরি পেতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বন্ধ জুট মিলের কর্মীদের আত্মহত্যার খবর মাঝে মাঝেই কাগজে বেরোয়।

মেশিন রুমে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে জহর। দাঁড়িয়ে থাকছে চুপ করে।

জুলি কাকিমার দেহটা নিয়ে গেছে মর্গে।

পোস্টমর্টেম কীভাবে করে? কাগজে বোধহয় একবার পড়েছিল জহর, ওটা প্রধানত ডোমদের কাজ, ডোমরা মড়ার জামা-কাপড় সব খুলে পেটটা কেটে ফেলে, একজন ডাক্তারবাবু পাশে দাঁড়িয়ে নিজের নাক টিপে শুধু দেখেন।

দৃশ্যটা ভাবতে চায় না জহর। তবু যেন সে হুবহু দেখতে পাচ্ছে!

টপ ডেকের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে কাজ করে রমেশ। সে এক সময় বলল, কী হে সরকার, আজ কী হল তোমার?

ঘোর ভেঙে জহর বলল, কই, কিছু হয়নি তো!

রমেশ বলল, মাঝে মাঝে হাত গুটিয়ে নিচ্ছ যে! ভাই একটা কথা বলব? এটা ইউনিয়নের কথা নয়, আমার নিজের কথা। আমরা টিফিন টাইমে বিক্ষোভ দেখাব, সে ঠিক আছে। কিন্তু অন্য সময় কাজে ঢিলে দেওয়া একদম ঠিক হবে না। প্রোডাকশন কমে গেলে আমাদের দাবিও ঢিলে হয়ে যাবে!

জহর ফ্যাকাশে ভাবে হাসল।

আজ রমেশ তাকে এই কথা বলছে? জহর কখনও কাজে ফাঁকি দেয় না। কাজ তার নেশা। আজ সে কেন মন বসাতে পারছে না, তা কে বুঝবে?

অফিসে আসার পর অনেককেই সে ওই খুনের বিষয়ে আলোচনা করতে শুনেছে। আজও কাগজে অনেকটা বিবরণ আছে। পুরুষ-হত্যার চেয়ে নারী-হত্যা খবরের কাগজে বেশি গুরুত্ব পায়। আজ জুলি বসুর ছবি আছে। কয়েক বছর আগেকার ছবি, অপূর্ব সুন্দর।

সহকর্মীদের নানান ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য যেন জহরের গায়ে চাবুকের মতন লেগেছে। অথচ প্রতিবাদ করে লাভ নেই। জহর চুপ করে থেকেছে।

ইউনিয়নের ঘরে একটা টেলিফোন থাকে। দু' টাকা দিতে হয়।

শ্রেয়া কাল ওর নম্বর দিয়ে দিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত শ্রেয়ার সঙ্গে

আপনি-আপনি সম্পর্ক ছিল, কাল সকালে, জুলি কাকিমার মৃতদেহের সামনে হঠাৎ শ্রেয়া তাকে তুমি বলতে শুরু করেছে। একটুও অস্বাভাবিক শোনায়নি।

—শ্রেয়া, আমি জহর।

—হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি বেরুচ্ছিলাম। তুমি কি ওখানে আসছ?

—এখন... সেরকম কোনও দরকার আছে? আমি অফিসে এসেছি, একটা বিশেষ কারণে এখন ছুটি নেওয়া খুব শক্ত।

—তা হলে তোমার না এলেও চলবে। নয়না পৌঁছে গেছে, আমি কাল সারারাতই ছিলাম ওখানে, সকালে একবার বাড়িতে এসেছি। পোস্টমর্টেম হয়ে গেছে, বারোটার পর বডি ফেরত পাঠাবে।

—কী রিপোর্ট পাওয়া গেল?

—সে-সব গোরি ডিটেইলস আমি তোমাকে এখন শোনাতে পারব না। পরে জেনে নিয়ো। মোট কথা, বডি এলেই ক্যাওড়াতলা ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রশান্তকাকা গুম মেরে আছেন, কিছুই বলছেন না। নয়না বলছে, আমারও তাই মত, বডি আর রেখে লাভ নেই। ওর দিদি আসতে পারবেন না। শি ইজ এইট মানথস প্রেগন্যান্ট।

—তা হলে ক'টার সময়...

—জহর একটা কথা বলব? জুলি কাকিমা আর নেই। একটা ডেড বডি, সব ডেড বডিই এক। তা নিয়ে আদিখ্যেতা করার কোনও মানে হয় না। তোমার যদি অফিসে জরুরি কাজ থাকে, সেটা ফেলে শ্মশানে দৌড়ে আসা অ্যাবসলিউটলি আননেসেসারি। সৎকার সমিতির গাড়ি বলা আছে, এখন ডেড বডি ঠিক কখন আসবে, ক্যাওড়াতলায় শুনেছি লাইন দিতে হয়, সবটাই আনসার্টেন।

— তা হলে আমার না গেলেও চলে?

—সেটা তুমি বিবেচনা করে দেখো। আমার মতটা বললাম। এরপর একদিন আমরা সবাই মিলে বসে জুলি কাকিমার কথা বলব। শ্মশানে যাওয়া বা না-যাওয়া ইমমেটেরিয়াল।

—শ্রেয়া।

—কী?

—না কিছু না।

—অফিসে বসে কাঁদতে নেই, জহর।

—না, না, ঠিক আছে।

—সন্ধের পর এসো, তখন দেখা হবে।

টেলিফোনটা রাখার পরেও জহরের শরীরটা কাঁপছে। সত্যি হঠাৎ কান্না এসে গেল, শ্রেয়া ঠিক বুঝতে পেরেছে, কী করে বুঝল?

সব ডেড বডিই এক। শ্রেয়া বিজ্ঞানের ছাত্রী, তাই অনায়াসে এমন কথা বলতে পারল। জহর বিজ্ঞান ভুলে গেছে, এরকম কথা সে ভাবতেই পারে না। অবশ্য শ্মশানে যাবার ব্যাপারে তার মন সায় দিচ্ছিল না একেবারেই। ইলেকট্রিক চুল্লিতে তো কিছু দেখাও যায় না।

তবু কান্না আসছে। তবু কান্না আসছে। বাথরুমে দৌড়ে গিয়ে চোখে জল দিতে লাগল জহর।

পুরো অফিস করে, তারপর সহকর্মীদের জটলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, জহর থিয়েটার রোডে পৌঁছোল পৌনে সাতটায়।

দরজা খুলে দিল সাদা উর্দিপরা একজন আর্দালি গোছের লোক। এরকম কাজের লোক বোধহয় দৈনিক রেটে ভাড়া পাওয়া যায়।

অ্যাপার্টমেন্ট একদম ফাঁকা! কেউ নেই। এ যেন শূন্যতার চেয়েও আরও চরম শূন্যতা।

আর্দালিটি জানালেন যে সাহেব ভেতরের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। শ্মশানের কাজ শেষ হয়ে গেছে বেলা তিনটের মধ্যে। হ্যাঁ, সাহেবের মেয়ে এতক্ষণ ছিলেন, এই একটু আগে বেরিয়ে গেছেন আর একজন মেমসাহেবের সঙ্গে। ঘণ্টা দু' এক পরে ফিরবেন বলে গেছেন।

জহর বসে একটা সিগারেট ধরাল।

তার মায়ের মৃত্যুর সময় সে দেখেছে, কোথা থেকে দূর দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন এসে বসে থেকেছে বহুক্ষণ। তিন-চারদিন সারা বাড়ি একেবারে ভর্তি। কেউ কেউ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছে, কেউ কেউ শুরু করেছে লম্বা গল্প।

এখনও তাদের পাড়ায় কোনও মৃত্যু হলে সেই একইরকম দৃশ্য। গরিবদের শোক এইরকম, অনেকেই অযাচিতভাবে আসে, নানারকম উপদেশ দেয়। সেই সময় নাকি একা থাকতে নেই।

এঁদের এখানে অন্যরকম। এখানে কেউ চেঁচিয়ে কাঁদে না। চেনাশুনো, আত্মীয়স্বজন আর কেউ নেই, তা তো হতে পারে না। খবরের কাগজ থেকে সবাই জেনেছে। হয়তো তারা এসে দু'দশ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শোক জানিয়ে গেছে।

নয়না শ্রেয়ারই মতন বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে। সে-ও মায়ের জন্য পা ছড়িয়ে বসে কাঁদবে না। দুপুরে পোড়ানো হয়েছে মাকে, এরই মধ্যে সে বাবাকে একলা রেখে বাইরে বেরিয়েছে।

জহর শুধু শুধু বসে থেকে কী করবে?

বারবার তার চোখ যাচ্ছে পিয়ানোটার দিকে। সামনের টুলটা, জুলি কাকিমা যেন এখনও এখানে বসে বাজাচ্ছেন। জহর শুনতে পাচ্ছে টুং টাং শব্দ।

জহর উঠে পড়ল।

প্রশান্তকাকাকে ডেকে তোলার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশান্তকাকা জেগে থাকলেও তাঁর সঙ্গে কী কথা বলত জহর? তিনি নিজে থেকে তো কোনও কথাই বলছেন না। এমনিতেই সে শুধু প্রশান্তকাকার সঙ্গে বসে কখনও দু'চার মিনিটের বেশি কথা বলেনি। কেমন যেন জড়তা বোধ করেছে।

জহর যে এসেছিল, সে কথাটা অন্যরা জানবে কী করে? জানানো কি দরকার? নাঃ, কোনও মানে হয় না।

জহর সারা ঘরটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আবার ঠিক আগেকারই মতন। যেন এক্ষুনি জুলি কাকিমা ভেতর থেকে আসবেন।

মাত্র পরশুদিন ঘটেছে ঘটনাটা। আজ সন্ধেবেলাতেই ঘরটা শূন্য। এবার থেকে এরকম শূন্যই থাকবে। আর কীসের টানে অন্যরা আসবে এখানে?

অন্যমনস্কভাবে লিফটের বদলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল জহর।

গেট দিয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে খপ করে একজন তার হাত চেপে ধরল। জহর চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখল অখিল।

অখিলের এ রকম চেহারা জহর আগে কখনও দেখেনি।

অখিল সব সময় সাজগোজে টিপটপ থাকে। মদ খেয়ে মাতালও হয় না। আজ তার এ কী দশা! পাঞ্জাবিতে ঝোলের দাগ, থুতনির ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ভেজা, চোখ টকটকে লাল, চুল উশকোখুশকো।

জড়ানো গলায় বলল, অ্যাই শালা। তুই ওপরে কী করছিলি? ওখানে আর কী আছে?

জহর বলল, তুমি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? কতক্ষণ?

অখিল বলল, কে জানে কতক্ষণ! মাল খেতে যাচ্ছি, আর উঠে উঠে আসছি। এখানে এসে মনে পড়ছে, আর তো ওপরে যাবার কোনও কারণ নেই। চল, আমার সঙ্গে মাল খাবি চল।

জহর বলল, না, অখিল, তুমি তো জানো- –

অখিল হুংকার দিয়ে বলল, যাবি না মানে? আলবাত যেতে হবে। তোর ঘাড় যাবে।

জহরকে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতে গিয়ে অখিল নিজেই হুড়মুড়িয়ে

পড়ে গেল রাস্তায়।

পথচারীরা তাকিয়ে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেল।

জহর রাগ করেনি। এক একজনের প্রতিক্রিয়া এক একরকম। কোনও ব্যাপারে বেশি আঘাত পেলে মদ্যপায়ীরা বেশি মদ খায়, এ তো জানা কথাই, দুঃখ ভুলবার জন্য মদে ডুব দেয়। যেমন দেবদাস। অখিলের আজ সে রকম হয়েছে।

সে অখিলের হাত ধরে তুলে দিয়ে নরমভাবে বলল, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি ঠিক আছে।

অখিল ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে-পড়া লোকগুলোকে চোখ রাঙিয়ে বলল, কী দেখছেন? সঙ দেখছেন? মদ খেয়েছি, বেশ করেছি।

জহর তাকে টানতে টানতে দূরে নিয়ে গেল।

অখিল বিড়বিড় করে বলল, মাথায় খুব জোর লেগেছে। মাথাটা ফেটে গেছে নাকি, দ্যাখ তো!

জহর তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, না। সে রকম তো কিছু দেখছি না।

অখিল বলল, আরও মাল খেতে হবে। চ, গ্রিন হাউজে যাই।

জহর বলল, কী করছ অখিল, তোমার পা টলছে, এর পর বাড়ি ফিরবে কী করে?

অখিল দুলতে দুলতে বলল, বাড়ি ফিরতেই হবে, এমন কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে? চল, চল।

জহর বলল, তা হলে ভাই আমায় মাপ করতে হবে। আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাব।

আবার জহরের হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় অখিল বলল, তুই আমায় ছেড়ে চলে যাবি? যাঃ শালা। আর কোনওদিন তোর সঙ্গে দেখা হবে না। বউদি নেই, বউদি নেই—

আচমকা জহরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে রাস্তা পার হতে গেল অখিল। এক সঙ্গে তিন-চারটে গাড়ি ব্রেক কষল। একটা ট্যাক্সির চাকার তলায় নির্ঘাত পড়ে গেছে, এই ভেবে চোখ বুজে ফেলল জহর।

অখিল একদিন বলেছিল, মাতালের একটা আলাদা ভগবান আছে। সেই ভগবান সব সময় মাতালদের বাঁচিয়ে দেয়। সেই কথাটা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছিল এক্ষুনি। সব ভগবানেরই তো মাঝে মাঝে ছুটি দরকার। এই মুহূর্তে যে অখিলকে বাঁচাল, সে ভগবান নয়, ট্যাক্সি ড্রাইভার। দারুণভাবে ব্রেক কষায় তার ট্যাক্সি অখিলকে ছুঁয়েছে শুধু, আর এক ইঞ্চি এগোলে

অখিল শেষ হয়ে যেত।

সব ড্রাইভাররা অখিলকে গালাগাল দিতে শুরু করেছে, এবারও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল জহর। অখিল জড়ানো গলায় বলল, আমার চশমা? আমার চশমাটা কোথায় গেল?

একজন কেউ খুঁজে দিল চশমাটা।

সামনেই একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে তাতে অখিলকে তুলে বসল জহর। কড়া গলায় বলল, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। তোমার বাড়ি কোন দিকে বলো—

অখিল মিনমিন করে বলল, ফুলডাঙায়। সি আই টি দিয়ে যেতে বলো। তারপরেই জহরের কাঁধে মাথা রেখে সে কাঁদতে লাগল হু হু করে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল, বউদি নেই, বউদি যে আমার জীবনে কতখানি ছিল, তুই বুঝবি না জহর, আমাকে যে কী ভালবাসত। এ রকম যে কোনও মানুষ হতে পারে, এত ভাল, ওফ্ ওফ, কোন শুয়োরের বাচ্চারা তাকে মেরে দিল, পৃথিবীটা নরক হয়ে যাচ্ছে দিন দিন জহর, তুই আমায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিস, তুই আমার হয়ে একটা শুয়ারের বাচ্চাকে মারতে গিয়েছিলি, তুই আমার খাঁটি বন্ধু ... আমিও নরকে ডুবে গেছি...

অখিলকে কাঁদতে দিল জহর।

অখিল এর আগে কখনও জহরকে তুই বলেনি। একজনের মৃত্যু হঠাৎ যেন অনেককে ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছে।

একটু পরে সোজা হয়ে বসে অখিল বলল, একটা সিগারেট দে।

দুজনে সিগারেট ধরাবার পর অখিল তেতো গলায় বলল, ওই শালা বুড়োটাই তো দায়ী!

—বুড়োটা মানে? কে?

—ওই যে ডক্টর প্রশান্ত বোস। সবসময় ভারিক্কি সেজে থাকে। সমাজসেবা না ছাই। এক নম্বরের পারভার্ট।

—কী বলছিস অখিল?

—যা বলছি, ঠিকই বলছি। অখিল সেনগুপ্ত কখনও বাজে কথা বলে না। বেশ্যাদের ছেলেমেয়েদের উপকার করার জন্য প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে, তাই না? বুড়ো ওখানে একজন রক্ষিতা রেখেছে। নিজের বাড়িতে অমন সুন্দরী বউ, তবু অন্য দিকে ছোঁক ছোঁক। এ-সব জেনে ফেলেছিল বলেই তো জুলি বউদির মনে ইদানীং একেবারে শান্তি ছিল না।

—এ কখনও সত্যি হতে পারে? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারিনি।

—তোরা কেউ বোঝার চেষ্টা করেছিলি? জুলি বউদি আমাকে সব কথা

খুলে বলত। ক্লিনিক বন্ধ হয়ে যায় সাড়ে ছটার সময়, তার পরেও ডাক্তার বোস সোনাগাছিতে কী করত অত রাত পর্যন্ত? সন্দেহ হওয়ায় আমি কয়েকদিন ফলো করেছি। গ্রে স্ট্রিট আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড় থেকে এগিয়ে প্রথম বাঁ দিকে গলি, কয়েকখানা বাড়ি ছেড়ে এক বাড়ির একতলায় একটা ওষুধের দোকান, সেই বাড়ির তিনতলায় থাকে ডাক্তার বোসের রক্ষিতা। আমি ওই বাড়ির সামনে রেগুলার ওঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

—আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

—তুই আর দুনিয়াটা কতটুকু চিনিস? ক'টা মানুষ দেখেছিস? আমার ধারণা, ডক্টর বোসই বউকে খুন করেছে। নিজের হাতে না হলেও ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে এ রকম তো আজকাল আকছার হয়। হাজার পাঁচেক দিলেই খুনি পাওয়া যায়।

—কিন্তু উনি খুন করাবেন কেন?

—হয়তো গয়নাগুলো দরকার ছিল। কিংবা জুলি বউদি সব জেনে ফেলেছিল। অনেক কারণ থাকতে পারে। দেখা যাক না, পুলিশ কী করে, তারপর আমি সব জানাব। আমি ছাড়ব না। যে-ই ও কাজ করুক, আমি প্রতিশোধ নেবই। জহর, তোর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না?

—তা করে।

—আসানসোল থেকে ফোন করেছিলাম, তুই যখন আমাকে খবরটা দিলি, বাঁই-ই করে আমার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এত আনএক্সপেক্টেড, এত বড় আঘাত আমি জীবনে পাইনি।

—তুই আসানসোল কবে গিয়েছিলি, অখিল?

—মঙ্গলবার। ভোরের ট্রেনে। মস্ত বড় একটা অর্ডার পাবার আশা ছিল। কাজ কিছুই হল না। খবরটা পেয়েই কাল ফিরে আসতে হল। তাও কত ঝামেলা, পার্সটা হারিয়ে ফেলেছি কিংবা কেউ চুরি করেছে, টাকা পয়সা কিস্যু নেই, কার্ডগুলোর জন্য থানায় ডায়েরি করতে হল। তারপর কতজনের কাছ থেকে ধার করে...

—মঙ্গলবার গিয়ে, বেস্পতিবার ফিরলি?

—ইয়েস। অন্তত শনিবার পর্যন্ত থাকা দরকার ছিল। সে আমার যত টাকাই লস্ হোক, কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু বউদি, বউদি, জীবনে একটা দিকে যেন ধস নেমে গেল। তোদের সঙ্গেই বা আর কোথায় দেখা হবে, বল?

—সেদিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি আমার। আবার পুরনো গর্তে

ফিরে যাব।

ফুলডাঙায় সরু গলির মধ্যে ট্যাক্সি ঢোকাতে ড্রাইভার আপত্তি জানাল। তবু অখিল তাকে ধমকাতে লাগল, চলো, চলো বলছি, আমি রোজ ট্যাক্সিতে ফিরি—

বাচ্চারা খেলছে, রাস্তার ধারে খাটিয়া পেতে লোক বসে আছে। কোনও রকমে সেই গলিটা পেরুবার পর আবার একটা চওড়া জায়গা। হাউজিং এস্টেট, লোহার গেট, ভেতরে বাগান, ছোট ছোট দোতলা বাড়ি, তারই মধ্যে একটি অখিলের। বেশ সুন্দর, ছিমছাম।

ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়ে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল অখিল। এবার পা মচকেছে, উঃ আঃ শুরু করেছে।

জহর তাকে ধরে ধরে নিয়ে এল। ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে হল তাকেই।

বেল দিতে হল না, দরজা খুলে দিল একটি মেয়ে। তেরো-চোদ্দো বছর বয়েস। হলুদ ফ্রক পরা, টানাটানা দুটি চোখ।

অখিল ধরা গলায় বলল, আয় জহর, একটু ভেতরে বসে যা।

জহর বলল, আজ থাক।

অখিল বলল, আমার বউয়ের সঙ্গে আলাপ করবি না? এত দূর এসে

মেয়েটি বলল, আসুন।

অখিল বলল, কেয়া, ভেতরে এনে বসা, জহরকাকা, আমার কলেজ জীবনের বন্ধু।

ছোট হলেও বেশ একটি সাজানো বসবার ঘর আছে। গুটিকতক বেতের চেয়ার, মাঝখানে একটি ছোট, নিচু টেবিল। দেওয়ালে কয়েকখানা বিভিন্ন রকমের ফুলের ছবি বাঁধানো, একদিকের দেওয়াল জোড়া ভারতের রঙিন মানচিত্র।

অখিল জহরের চেয়ে অনেক বেশি অবস্থাপন্ন তা বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু বড় ব্যবসায়ীদের মতন বাড়ি মনে হল না। অখিল বলেছিল, তার নিজস্ব কম্পানি আছে, সেখানে সে জহরকে চাকরি দিতে চেয়েছিল।

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে অখিল বলল, কই গো, জয়া, এসো, আমার এক বন্ধু এসেছে। আমায় বাড়ি পৌঁছে দিল।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল জয়া। প্রথম দর্শনে মনে হয়, অখিলের চেয়ে তার বয়েস বেশি। বেশ লম্বা, মুখখানা শান্ত ধরনের। হাত জোড় করে নমস্কার জানাল।

অখিল জহরকে বলল, কী রে, মহিলাদের প্রথম দেখলে উঠে দাঁড়াতে হয় জানিস না?

জহর সত্যিই জানে না। জুলি কাকিমার ফ্ল্যাটের কেউ তাকে এটা শেখায়নি। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

জয়া বলল, বসুন, বসুন।

অখিল হাঁক দিল, কেয়া, বোতল আর গেলাশ নিয়ে আয়।

কেয়া বলল, বাবা, এখন আবার খাবে?

অখিল বলল, আর একটু খেতে হবে, না হলে ঘুম আসবে না।

জয়া বলল, আপনি তো বাইরে কোথাও থাকেন। ফিরবেন কী করে?

অখিল বলল, সেটা আবার কোনও প্রবলেম নাকি? এখান থেকে শিয়ালদা আর উল্টোডাঙা দুটোই কাছে। ট্যাক্সিতে দশ মিনিট।

জহর বলল, আমি বেশিক্ষণ বসব না।

কেয়া দুটো গেলাশ আর একটা অর্ধেক ভর্তি মদের বোতল নিয়ে এল।

অখিল বলল, দুটো গেলাশ লাগবে না। ও খায় না। সাধুপুরুষ।

জয়া বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এ-সব খান না?

জহর দু' দিকে মাথা নাড়াল।

—একে পেলেন কোথায়? আপনি সঙ্গে ছিলেন না?

—না। রাস্তায় হঠাৎ দেখা।

—মাতালদের কেউ সাধারণত বাড়ি পৌঁছে দিতে চায় না। কেন জানেন? বউরা মনে করে, সঙ্গীসাথীগুলোই তাদের স্বামীকে জোর করে বেশি খাইয়ে দিয়েছে। সেইজন্য যারা পৌঁছে দিতে আসে, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। আমি অবশ্য সেরকম মনে করি না। ওকে কে জোর করে বেশি খাওয়াবে? ও নিজেই তো সকলের চেয়ে বেশি খায়।

অখিল হা-হা করে হেসে উঠল।

জয়া জিজ্ঞেস করল, আপনি আজ প্রশান্তদার বাড়িতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কী হয়ে গেল বলুন তো! জুলি বউদিকে আমি দেখেছি অনেকদিন আগে। আমার দাদাও আর্মিতে ছিলেন। প্রশান্তদার সঙ্গে খুব ভাব ছিল।

অখিল বলল, সিমলায়।

জয়া বলল, না, মীরাটে। আমি তখন কিছুদিন ওখানে গিয়ে ছিলাম। প্রশান্তদা বয়েসে অনেক বড়, কিন্তু দাদার দেখাদেখি আমরাও প্রশান্তদা বলতাম। আমার দাদারা ওদিকেই রয়ে গেল, প্রশান্তদা কলকাতায় আসবার পর দাদাই আবার যোগাযোগ করিয়ে দেয়।

জহর বলল, আপনি ওখানে যান না কেন? আপনাকে দেখিনি।

জয়া বলল, একবার-দু'বার গেছি। আমি একটা স্কুলে পড়াই, সময় পাই

না। তা ছাড়া, জুলি বউদি ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যতটা পছন্দ করতেন, মেয়েদের সঙ্গে ততটা নয়।

অখিল প্রতিবাদ করে বলল, মোটেই না! বাজে কথা। ওখানে অনেক মেয়েরা আসে।

জয়া ভ্রূভঙ্গি করে বলল, আর তাদের টানেই তো তুমি ঘনঘন ওখানে যাও! সঙ্গে বউ থাকলে অসুবিধে!

কেয়া বলল, আমার স্কুলের বন্ধুরা বলে, তোর বাবার এখনও বেশ হিরো হিরো চেহারা!

জয়া বলল, সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানেন, জুলি বউদির সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হত মাঝে মাঝে, হঠাৎ কয়েকদিন আগে ফোন করে আমাকে গত মঙ্গলবার যাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছিলেন। বিশেষ করে বলেছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার ভোরেই তো অখিল আসানসোল চলে গেল, মেয়েদুটোকে নিয়ে আমি যাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কেয়া কিছুতেই রাজি হল না, ওকে আমি কখনও একা রেখে যাই না বাড়িতে, তাই যাওয়াই হল না। পরে খবরটা শুনে এত খারাপ লাগল!

কেয়া বলল, আমাকে দায়ী কোরো না, মা। আমি কি জানতাম ওরকম কিছু হয়ে যাবে!

ছোট মেয়েটির বয়স ন'-দশ বছর। সে এসে দাঁড়াল মায়ের পাশে।

জহর তার নাম জিজ্ঞেস করতে সে স্পষ্ট গলায় বলল, দেয়া।

জহর দু'বার জিজ্ঞেস করেও বুঝতে পারল না, ভুল শুনছে কিনা, সে দেয়া কথাটার মানে জানে না।

অখিল সেটা বুঝতে পেরে বলল, 'গগনে গগনে ডাকে দেয়া', গান আছে, শুনিসনি? দেয়া মানে মেঘ।

জয়া বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিন না। বাড়িতে যা আছে।

জহর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, না, না, আমাকে এখন ফিরতে হবে। বাড়িতে কিছু বলা নেই।

অখিল বলল, আজ বাড়িতে কিছু ভাল মাছ-টাছ আছে? খাওয়াবে যদি, ভাল করে খাওয়াবে। আর একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াও।

জয়া বলল, ঠিক আছে। আর একদিন আসবেন তো?

জহর বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব।

আট

পুলিশের এরকম তৎপরতার নজির খুবই দুর্লভ।

মাত্র চারদিনের মধ্যে জুলি বসু নৃশংস হত্যার সমাধান হয়ে গেল।

ডাক্তার প্রশান্ত বসু প্রাক্তন আর্মি অফিসার, সেইজন্যই বোধহয় পুলিশ বেশি সক্রিয় হয়েছে। তা ছাড়া সরকারি ওপর মহলের অনেকেও তাঁকে চেনে।

সিরাজুল তারিখেরই পুরো কৃতিত্ব। তিনি পরিচারিকা বেলার খোঁজে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। বেলার সত্যিই খুব অসুখ, বুকে ব্যথা। তার যে ছেলে জেল খেটেছিল, সে এখন মুদির দোকান খুলেছে। সে আর কোনও খারাপ দলে মেশে না।

বেলার কাছেই সন্ধান পাওয়া গেল রঘুর। রঘু আগে ওই ফ্ল্যাটে কাজ করত, প্রশান্ত বসুর সঙ্গে মুখে মুখে কথা বলায় তিনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। রঘু তবু ও বাড়ির নীচের তলার কাজের লোকেদের সঙ্গে গল্প করার জন্য আসত মাঝে মাঝে। বেলার সঙ্গে দেখা হলে তার মনিব সম্পর্কে ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলত।

রঘু পরে কাজ নিয়েছিল বেহালার রায়বাড়িতে।

সিরাজুল তারিখ সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলেন, সে বাড়ি থেকেও মাস ছয়েক আগে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে উদ্ধত স্বভাবের জন্য। তবে, রায়বাড়িতে রঘুর দেশের বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল, হুগলি জেলায় খোলাপোতা গ্রাম, রঘুর পুরো নাম রঘুনাথ দাস।

ভোরবেলা সিরাজুল তারিখ খোলাপোতা গ্রামে রঘুর বাড়িতে আচমকা হানা দিলেন। রঘু তো ছিলই সেখানে, তার ঘর সার্চ করে পাওয়া গেল, তিরিশ হাজার টাকা এবং একগাদা গয়না! বুদ্ধুর মতন সে গয়নাগুলো মাটির তলায় পুঁতেও রাখেনি।

বামাল রঘুকে নিয়ে আসা হয়েছে কলকাতায়।

রঘুকে জুলি বসু চিনতেন, সে নিশ্চয়ই সেদিন এসে কাকুতি মিনতি করায় জুলি বসু দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা জানা যাচ্ছে না এখনও। অবশ্য, একজন কোমল স্বভাবের মহিলাকে গলা টিপে মারার জন্য সে একাই যথেষ্ট।

সংবাদপত্রে পুরো বিবরণ বেরিয়েছে। আবার বহু বাড়িতে, ট্রামে, বাসে, অফিসে-অফিসে জুলি বসুর নামটা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। তাঁর স্বামী সন্দেহ থেকে মুক্তি পেলেন।

জহরও খবরের কাগজ থেকেই খবরটা জানল। পড়তে পড়তেই জহরের ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে জেলখানার গরাদ ভেঙে রঘুর টুঁটি চেপে মেরে ফেলতে। আদালতের বিচার হতে তো অনেকদিন সময় লাগে, ততদিনও ওর বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

এরকম ইচ্ছে অনেকেরই হয়, ক'জনই বা তা কার্যে পরিণত করে। ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে ফুঁসতে কিছুক্ষণ পর স্নায়ুগুলো আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় . অফিসে যাবার কথা মনে পড়ে।

আজ কি অফিসের পর একবার থিয়েটার রোডে যাওয়া উচিত? কে কে আসতে পারে? অখিল আসবে না, জানা কথা। সে প্রশান্ত বসুকে পছন্দ করে না। শ্রেয়া? রণবীর ঘোষাল সেদিনই বলে গিয়েছিলেন, আর বোধহয় দেখা হবে না।

নৈহাটির বাড়িতে ফোন নেই, কিন্তু জহর তার অফিসের ফোন নাম্বার শ্রেয়া, অখিলদের দিয়ে রেখেছে। প্রশান্তকাকার ফ্ল্যাটেও খাতায় লিখে এসেছে, কিন্তু কই, কেউ তো তাকে ডাকে না? কেউ ওকে প্রয়োজনীয় মনে করে না।

প্রশান্ত বসু শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করেন না, তাই মন্ত্র পড়ে শ্রাদ্ধ কিংবা লোক খাওয়ানো-দাওয়ানো কিছুই হবে না। আগামী রবিবার শুধু একটা স্মরণসভা ও গান-বাজনা হবে, সেটাও জানানো হয়েছে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে।

জহর বরাবর জেনে এসেছে, শ্রাদ্ধ না করলে হিন্দুর আত্মা স্বর্গে যেতে পারে না। নিরালম্ব, বায়ুভূত আত্মাকে পিণ্ডদান করতে হয়। জুলি কাকিমার আত্মাও কি ভেসে বেড়াচ্ছে? আত্মা কি দেখতে পায়?

এর মধ্যে জহর একদিনও জুলি কাকিমাকে স্বপ্নে দেখেনি।

অফিস ছুটির পর জহর উল্টোডাঙা স্টেশনে এসে, ভিড় ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। নৈহাটির ট্রেন ধরবে, না শিয়ালদার? আগে কলকাতা তার মন টানত, এখন সেখানে গিয়ে সে কী করবে? সে অখিলের পাল্লায় পড়তে চায় না। কলকাতায় তার নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। শ্রেয়া, লিপি, রণবীরদের সঙ্গেও সে অযাচিতভাবে দেখা করতে যাবে কেন? ওদের সঙ্গে কোনও আলোচনায় যোগ দেবার মতন যোগ্যতাও তো তার নেই।

কেন্দ্রবিন্দুই সরে গেছে, এখন সবাই আবার আলাদা।

দু'দিন পরে জহর একটু আগে অফিস থেকে বেরিয়ে কলকাতায় এসে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে একটা নাটকের টিকিট কাটল। নাটক দেখতে তো আসতে পারে যে-কেউ।

শ্রেয়াকে প্রথম দৃশ্যে চিনতেই পারেনি জহর। সে সেজেছে চাষির মেয়ে, মুখে একটা বোকা বোকা ভাব, গলার আওয়াজটাও বদলে ফেলেছে একেবারে। ক্রমশ দৃশ্যের পর দৃশ্যে তার চরিত্রের বদল হয়, মুখে ফুটে ওঠে বুদ্ধি ও দৃঢ়তার ছাপ, গলায় আসে তেজ, একেবারে শেষের দিকে সে এক দঙ্গল মেয়ের নেত্রী। হঠাৎ মরেও গেল দুম করে। অন্য একটি মেয়ে তাকে বিষ খাইয়ে মারল।

নাটকটা তেমন কিছু ভাল লাগল না জহরের। একটু একঘেয়ে। গানটান নেই। সব কথার মানেও বোঝা যায় না।

শ্রেয়ার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হবে, জহর আশা করেনি। শ্রেয়া নাটক দেখতে বলেছিল কয়েকবার, আগে আসা হয়নি।

শেষ দুটো দৃশ্যে শ্রেয়া নেই, সে আগেই মেক আপ তুলে পোশাক বদলে ফেলেছে, আবার সেই জিন্‌স ও টি-শার্ট, এখন তাকে দেখে কে বলবে, একটু আগে সে এক চাষির মেয়ের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করেছে!

দু'তিনজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে শ্রেয়া। এ দিকে পিঠ ফেরানো।

জহর দোনামোনা করতে লাগল, ডাকবে, কি ডাকবে না?

নাটক সম্পর্কে তার মতামতের কী মূল্য আছে? শুধু ভাল লেগেছে বললে বোকা বোকা শোনাবে না? ওরা সব ইনটেলেকচুয়াল, তার সহকর্মীদের ভাষায় আঁতেল, ওদের ভাষা অন্যরকম।

তবু জহর দাঁড়িয়ে রইল। শ্রেয়াকে ডাকার অধিকার হয়তো নেই তার, কিন্তু দূর থেকে দেখার তো অধিকার আছে!

দর্শকরা সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে, একপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে জহর। শ্রেয়ার কথারও যেন শেষ নেই।

অন্য লোক দুটি শ্রেয়ার কাছ থেকে বিদায় নিল। তারপর শ্রেয়া অন্যমনস্কভাবে হেঁটে গেল জহরের পাশ দিয়ে, জহরকে দেখতে পেল না। জহরও ডাকল না।

খানিকদূর গিয়ে শ্রেয়া ফিরে তাকাল।

ভ্রূ কুঁচকে বলল, জহর?

জহর একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

কাছে এসে শ্রেয়া জিজ্ঞেস করল, তুমি নাটক দেখতে এসেছ?

জহর মাথা নাড়ল।

মনে মনে সে বলল, আসল সত্যি কথাটা এই যে, আমি নাটক দেখতে আসিনি, তোমাকে দেখতে এসেছি।

শ্রেয়া আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি খবরটা শুনেছ?

জহর বলল, কী? রঘু ধরা পড়েছে, সেটা?

শ্রেয়া জহরের হাত ধরে টেনে এক পাশে নিয়ে গিয়ে বলল, রঘুকে মিথ্যেমিথ্যি ধরেছে, টর্চার করেছে, রঘু খুন করেনি।

—রঘুর কাছে যে সবকিছু পাওয়া গেছে?

—দেখো, বাড়িতে কিছু একটা চুরিটুরি হলেই লোকে কাজের লোকদের সন্দেহ করে। যেন তারা সবাই খারাপ। ভদ্দরলোকেরা চুরি করে না?

—কিন্তু রঘুর কাছে জুলি কাকিমার গয়না, টাকা পয়সা।

—রঘু ছেলেটা ভাল নয় ঠিকই। কুসংসর্গে পড়েছে। তা বলে তার ওপর খুনের দায় চাপানো হবে? সে হাজারবার অস্বীকার করেছে, তবু কেউ শোনেনি।

— তা বলে জুলি কাকিমার গয়না ওর কাছে গেল কী করে?

—ওগুলো জুলি কাকিমার গয়না নয়।

—তার মানে?

—ওগুলো শস্তার গয়না। বেশ কিছু ঝুটো গয়না। রেল ডাকাতদের একটা গ্যাঙের সঙ্গে ভিড়েছে রঘু। নিজে অ্যাকশানে যায় না, লুঠের মাল আর টাকা পয়সা নজর রাখে। হুগলি জেলার পুলিশ তাদের একটা ডাকাতকে ধরেছে, সে লোকটাও রঘুকে তাদের দলের লোক হিসেবে স্বীকার করেছে। ট্রেনে আজকাল কেউ দামি গয়না পরে যায়? জুলি কাকিমা ও-সব গয়না কখনও ছুঁয়েও দেখতেন না। নয়না গিয়ে ওগুলো দেখেই সে কথা বলেছে!

—তা হলে তো ব্যাপারটা আবার গোলমেলে হয়ে গেল।

—ব্যাপারটা খুব খারাপ দিকে গেছে, জহর। পুলিশ এখন প্রশান্ত কাকাকে সন্দেহ করছে। কেউ একজন সিরাজুল তারিখকে উড়ো ফোন করে প্রশান্ত কাকা সম্পর্কে অনেক খবর দিয়েছে। তাতে খুব আপসেট হয়ে পড়েছে নয়না। প্রশান্ত কাকার একটা ব্যাপার ঠিক এক্সপ্লেইন করা যাচ্ছে না। রঘু ধরা পড়ার পর প্রশান্ত কাকাই প্রথম গয়নাগুলো দেখেছিলেন, আর সেগুলো জুলি কাকিমার গয়না বলে আয়ডেন্টিফাই করেছিলেন।

—সেটা হয়তো, ওঁর যা মনের অবস্থা, তা ছাড়া পুরুষ মানুষ কি গয়না-টয়না ভাল চেনে?

—মোট কথা, রঘু ও কাজ করেনি, সেটা ডেফিনিট। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে প্রশান্তকাকা এ রকম কাজ করতে পারেন। তোমার কী মনে হয়!

জহরের চোখের সামনে বিদ্যুৎ ঝলকের মতন একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। দৃশ্যটা সে বারবার সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, রঘু ধরা পড়ার পর মুছে ফেলতেই চেয়েছিল। আবার ফিরে এল দৃশ্যটা।

সে অস্পষ্ট ভাবে বলল, কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

শ্রেয়া জহরের চোখে চোখ রেখে ধারালো গলায় বলল, যারা চলে যায়, তাদের আর ফেরানো যায় না কিছুতেই। সেটা মেনে নিতেই হয়। কিন্তু যারা থাকে, তাদের জীবনটা যাতে এইসব কারণে নষ্ট না হয়, সেটাই দেখা দরকার। নয়না আমার বন্ধু, যদি প্রমাণ হয় যে তার বাবা-ই তার মাকে অমন নৃশংসভাবে খুন করেছে, তা হলে কি সে আর সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারবে?

জহর চুপ করে রইল।

শ্রেয়া আবার বলল, তুমি কি বাড়ি ফিরবে এক্ষুনি? চলো না থিয়েটার রোডে, নয়না থাকবে, তোমার সঙ্গে তো এখনও দেখাই হল না। প্রশান্ত কাকা একটা ভাল করেছেন, কয়েকদিন যে একেবারে গুম হয়ে বসে থাকতেন, সেটা কাটিয়ে উঠেছেন, আবার শুরু করেছেন কাজকর্ম।

জহর মন ঠিক করে ফেলেছে।

সে বলল, না, আজ থিয়েটার রোডে যেতে পারছি না। অন্য একটা কাজ আছে।

—তা হলে কাল এসো। কাল আমি ওখানে সন্ধেবেলা থাকব। তার আগে সারাদিন বাড়িতে। ফোনও করতে পারো।

—শ্রেয়া, তোমার পার্ট খুব ভাল হয়েছে। ভাল লেগেছে আমার।

—তা তো লাগবেই। আমি কি খারাপ অভিনয় করি? জহর, তুমি আমাদের গ্রুপে যোগ দেবে?

—আমি? জীবনে কক্ষনও...

—ব্যস, ব্যস, ও কথাটা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। আমরা অনেক কাজই জীবনে প্রথম করি। প্রথম যখন একটি মেয়েকে চুমু খেয়েছিলে, তখন কি ভেবেছিলে যে আগে তো কক্ষনও চুমু খাইনি, তা হলে কি খাওয়া উচিত? আমাদের পরের নাটকে তোমার মতন টাফ্ চেহারার একটা ক্যারেক্টার আছে, তোমাকে ট্রায়াল দেওয়া হবে, যদি তোতলামি না থাকে, তা হলে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যাবে। যাক গে, সে তো এক্ষুনি নয়। কাল আসছ?

—আসব।

বাইরে এসে, রাস্তা পেরিয়ে জহর উল্টো দিকের বাস ধরল।

মনটা হঠাৎ ফুরফুরে হয়ে গেছে। শ্রেয়া তাকে তাদের দলে যোগ দেবার জন্য ডাক দিয়েছে। নাটকের অভিনয় হয়তো তার দ্বারা সম্ভব হবে না, তবু তো কয়েকদিন আসা হবে। মফস্বল ছেড়ে কলকাতায় আসা।

তার আগে সেই দৃশ্যটার মীমাংসা দরকার।

গ্রে স্ট্রিট আর সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের মোড়ে নেমে পড়ল জহর। এ দিকেই কোথাও সোনাগাছির বেশ্যা পল্লী সে শুনেছে। বাঁ দিকে প্রথম গলি, হ্যাঁ, একটা বাড়ির তলায় ওষুধের দোকান। তিন তলায় কয়েকটা ঘরে আলো জ্বলছে। সদর দরজা খোলা।

সামনে একটা গাড়ি দাঁড়ানো আছে। প্রশান্ত কাকারই গাড়ি।

অখিল কেন ঘোরাঘুরি করেছে এ পাড়ায়? সে কি জুলি কাকিমার অনুরোধেই প্রশান্ত কাকাকে অনুসরণ করত?

সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে এল তিনতলায়।

সিঁড়ির ঠিক সামনেই একটা ঘরের দরজার ওপরে সাইন বোর্ড। তাতে লেখা 'পথের সাথী' যৌনকর্মী কল্যাণ সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

ঘরের মধ্যে একটা টেবিল ঘিরে দু'জন মহিলা ও তিনজন পুরুষ। তাদের মধ্যে একজন প্রশান্ত কাকা। সবাই বেশ জোরে জোরে কথা বলছে। আগামী মাসে কোথাও একটা কনফারেন্স হবে, সেই সম্পর্কে আলোচনা।

আড়াল থেকে একটুক্ষণ সেইসব কথা শোনার পর জহর নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

অখিল ভুল খবর দিয়েছে, কিংবা, সে কি এ বাড়ির সামনে প্রশান্তকাকার গাড়িটা কয়েকদিন দাঁড় করানো দেখেই খারাপ কিছু ধরে নিয়েছে, ওপরে উঠে এসে দেখেনি?

জুলি কাকিমাকে কি অন্য কিছু বুঝিয়েছিল অখিল?

এবার সে সেই দৃশ্যটাতে আবার মনোযোগ দিল।

কোনও ফটোগ্রাফকে বারবার এনলার্জ করলে যেমন অনেক খুঁটিনাটি ধরা পড়ে, সেই ভাবে সে দৃশ্যটাকে বড় করতে চাইল।

বুধবার দুপুরে, হ্যাঁ বুধবারই , নিশ্চিত বুধবার, তখন পৌনে তিনটে-তিনটে হবে, জহর মোমিনপুরে একটা বাড়িতে জলের মেশিন স্যার্ভিস করে বেরিয়ে আসছিল। সামনেই একটি গলি, সেই গলির এক প্রান্তের একটা বাড়ির দরজা দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে এল একটি যুবতী তারপর একজন লোক বেরিয়েই আবার ভেতরে ঢুকে গেল। যে লোকটি বেরিয়েই ঢুকে গেল, তার থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, অনেকটা অখিলের মতন। যেন

অখিল জহরকে দেখেই লুকিয়ে পড়ল ভেতরে।

হয়তো অখিল নয়। চেহারার মিল তো থাকতেই পারে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে অনেক লোককেই দূর থেকে এক রকম দেখায়। কিন্তু মানুষের চেহারা ছাড়াও সব মিলিয়ে একটা ভঙ্গি থাকে। আঙুলের ছাপের মতন প্রত্যেক মানুষের সেই ভঙ্গিটাও আলাদা। দরজা দিয়ে বেরিয়েই আবার দ্রুত ভেতরে ঢুকে যাওয়ার ভঙ্গিটা অবিকল অখিলের মতন।

অখিলের যা স্বভাব, তাতে অন্য মেয়েদের সঙ্গে প্রেম ট্রেম করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদি সেই লোকটি অখিলই হয়, তা হলে জহরকে দেখে লজ্জায় লুকোতে পারে। অবশ্য লজ্জা পাবারই বা কী আছে?

মুশকিল হচ্ছে দিনটা নিয়ে। সেদিন বুধবার। অখিল মঙ্গলবার আসানসোল চলে গেছে। বুধবার রাত্রে জুলি কাকিমা খুন হন, বৃহস্পতিবার সকালে অখিল আসানসোল থেকে ফোন করেছিল।

তা হলে অখিল নয়, অন্য লোক।

তবু দৃশ্যটা বারবার ফিরে আসছে কেন? যেন নিঃশব্দ দৃশ্যেরও কোনও ভাষা আছে, সে জহরকে কিছু বলতে চাইছে।

যদি অখিল মঙ্গলবার আসানসোলে গিয়ে বৃহস্পতিবার রাত্রে ফেরে, তা হলে বুধবার মোমিনপুরে দেখা লোকটা অখিল হতেই পারে না।

আসানসোল না গিয়েও তো টেলিফোনে বলা যায়, আমি আসানসোল থেকে কথা বলছি। আজকাল দিল্লি-মুম্বইয়ের ফোনের কথাও লোকাল কলের মতন শোনায়। কিন্তু অখিল মিথ্যে কথা বলবে কেন? অখিলের বউ জয়াও তো বলল, তার স্বামী মঙ্গলবার আসানসোল চলে গিয়েছিল।

মঙ্গলবার গিয়ে, বুধবার ফিরে, আবার বুধবার বেশি রাতে আসানসোল যাওয়া... জহর এ কথা ভাবছে কেন? দৃশ্যটা যে তাকে ছাড়ছে না।

ওটা আর একবার মিলিয়ে না দেখলে জহর কিছুতেই শান্তি পাবে না।

পরদিন সকালে জহর অফিসেই গেল না। খবরের কাগজে আবার জুলি বসু হত্যাকাণ্ডের খবর বেরিয়েছে। এবারে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে তাঁর স্বামীর দিকে। প্রশান্ত বসুকে লালবাজারে ডেকে নিয়ে জেরা করা হয়েছে দু'ঘণ্টা।

বারান্দায় বসে একটার পর একটা সিগারেট পোড়াতে লাগল জহর।

শান্তা দু'বার তাড়া দিয়ে গেছে। দীনেশও একবার জিজ্ঞেস করে গেলেন, কী রে, অফিসে যাবি না?

জহর মনস্থির করতে পারছে না।

নৈহাটি আর উল্টোডাঙা, সল্টলেক, এর মধ্যেই তার জীবন সীমাবদ্ধ থাকলে ক্ষতি কী? কী দরকার তার কলকাতায় যাবার? জুলি কাকিমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে পর্যন্ত যেমন চলছিল, তেমনই চলুক না। এই ভাবেই তো অনেকের জীবন কেটে যায়। রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান, স্টিফেন হকিং, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস এই সব এই গরিবের সংসারে ঢুকলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে না? ও-সব সকলের জন্য নয়।

হঠাৎ গায়ে জামা গলিয়ে, শান্তাকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল জহর। হন হন করে স্টেশনে যেতেই পেয়ে গেল ট্রেন। শিয়ালদা নেমেই বাসে চলে এল মোমিনপুর। দাঁড়াল সেই গলিটার কাছে।

ওই সেই কোণের বাড়ি। সবুজ রঙের দরজা। যুবতীটির মুখ এখন একেবারে স্পষ্ট। আর একটি ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা মুখ। সেই মুখটা কার?

জহর আস্তে আস্তে এগোল। কেন সে এসেছে? অখিল কী করে বা না করে, তা নিয়ে সে কেন মাথা ঘামাচ্ছে? অফিস না গেলে অন্য রকম মানে হবে, যেন সে সরে থাকতে চাইছে আন্দোলন থেকে। কিন্তু কেউ যেন ঘাড় ধরে তাকে টেনে এনেছে এখানে।

সবুজ দরজাটায় ঠকঠক শব্দ করতে করতেও জহরের মনে হল, বাড়িতে যদি কেউ না থাকে, বেশ ভাল হয়। তা হলে সে অনায়াসে ফিরে যেতে পারে। আর এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

দরজা খুলে দিল একটি মেয়ে। সেই যুবতী!

শাড়িটা কম দামি বা বেশি দামি যাই হোক মুখের একটা ভাব থাকে, তা দেখেই মনে হয়, এ মেয়েটাকে থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটের জমায়েতে একেবারে মানাবে না। শ্রেয়া বা লিপির মতন মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতাই এর নেই। অথচ মুখে একটা সারল্য আছে। অখিলের মতন একজন চৌকশ লোকের ওই রকম বান্ধবী? তা হলে ভুলই দেখেছে জহর।

মেয়েটি জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে আছে, একটা কিছু তো বলতেই হবে।

জহর বলল, নমস্কার, আপনার বাড়িতে অ্যাকোয়া গার্ড মেশিন আছে?

মেয়েটি বলল, আছে। এই তো নতুন বসিয়েছি।

জহর বলল, কম্পানি থেকে আমাকে পাঠিয়েছে। একবার চেক করে দেখে যেতে চাই।

মেয়েটি বলল, আসুন।

আন্দাজে ঢিল মারা। যদি মেয়েটি বলত, নেই, জহর তা হলে যন্ত্রটার

গুণাগুণ বিষয়ে দু'চার কথা বলে বিদায় নিত। তার কাছে কম্পানির আইডেনটিটি কার্ড আছে।

পাশাপাশি দু'খানা ঘর, বারান্দার এক পাশ ঢাকা দিয়ে রান্নার জায়গা। একটা ঘরের মধ্যেই ফ্রিজ, সেখানেই জলের শোধন যন্ত্র। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবেশের মধ্যে কিছুটা চালিয়াতির ভাব আছে।

বাড়িতে আর কেউ নেই, মেয়েটির সঙ্গে দু'চারটি টুকিটাকি কথা বলতে বলতে সে ঘরের মধ্যে আড়চোখে দেখে নিল। একটা আলনায় অনেক জামাকাপড়ের মধ্যে দুটো পুরুষের জামা ঝুলছে। একটা লুঙ্গি। খাটের পাশে একটা টেবিলের ওপর একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছোট ছবি, ছবিটা একটু ব্যাঁকা করে রাখা, খাটের এক পাশে না গেলে ঠিক দেখা যাবে না।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, আপনার কি বেশি সময় লাগবে?

জহর বলল, না, এই তো হয়ে গেছে। এই লাল আলোটা জ্বলে কিনা দেখে নেবেন। আর সব ঠিক আছে।

সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল।

গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে গেল বটে, কিন্তু বাস ধরার দিকে মন নেই।

সেই লোকটি অখিল ছিল কিনা, তা প্রমাণ হল না। মেয়েটির ঘরে একজন পুরুষ মানুষ থাকে, শুধু এইটুকু বোঝা গেল, সে তো ওর স্বামীও হতে পারে। অথচ কেন জহরের মনে হচ্ছে, মেয়েটি বিবাহিতা নয়? সিঁদুর-টিঁদুর আজকাল অনেকেই লাগায় না।

তা ছাড়া মেয়েটি মুসলমান হতে পারে, ক্রিশ্চান হতে পারে। এ পাড়ায় এ রকম অনেকে মিলেমিশে থাকে।

দেড় ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর গলির মোড়ে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। তার থেকে নামল অখিল। খুব ব্যস্ত ভঙ্গি।

এতক্ষণে জহর নিশ্চিন্ত হল বটে, কিন্তু হঠাৎ তার ভয়ও করতে লাগল। একজনের গোপন জীবনে ঢুকে পড়া কি ঠিক হল? যদি আরও ভয়ংকর কিছু গোপন থাকে?

অখিল মিথ্যে কথা বলেছে। বুধবার সে আসানসোলে ছিল না।

কেন মিথ্যে কথা বলল?

ব্যবসার জন্য বাইরে যাবার নাম করে সে মোমিনপুরে এসে থাকে। আজও অখিল এসে না পড়লে জহর সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারত না। অখিলের দুটো সংসার। প্রশান্ত বসু সম্পর্কে অখিল যে অভিযোগ করেছিল, সে নিজেই সে রকম জীবন যাপন করে।

এত টাকা উপার্জন করে অখিল? প্রকাশ্য জায়গায় একজন স্মাগলার তাকে ঘুষি মারে। যতদূর মনে হয়, টাকা পয়সার ব্যাপারে কথার খেলাপের জন্যই লোকটি রেগে গিয়েছিল।

সেখান থেকে জহর চলে এল হাওড়া স্টেশনে। আসানসোল যাবার কী কী ট্রেন আছে, খোঁজ নিল। তার ইচ্ছে করল, তক্ষুনি আসানসোল চলে যেতে। যেন তার নিয়তি সেখানে টানছে। যেতেই হবে।

কিন্তু তার পকেটে বেশি টাকা নেই।

বাড়ির বাইরে সে কখনও রাত কাটায় না। বাড়িতে কোনও খবর না দিলে শান্তারা সারা রাত জেগে থাকবে। থানায় খবর দিতে পারে। জহর খুব জোরে মাথায় ঝাঁকানি দিল। নাঃ, এরকম পাগলামি করা তার সাজে না।

সন্ধেবেলা থিয়েটার রোডে যেতে বলেছিল শ্রেয়া। যাবে কি? এখনও সন্ধে হতে ঢের দেরি। সারা দুপুরটা সে সুরেন্দ্রনাথ পার্কে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। অনেক বেকার লোক সেখানে শুয়ে থাকে, সে দেখেছে।

সুরেন্দ্রনাথ পার্কে এসে চিনেবাদাম কিনল বড় এক ঠোঙা। একটা একটা করে বাদাম ভেঙে খাচ্ছে। বারো বছর ধরে সে চাকরি করছে, কখনও এমনভাবে দিন কাটায়নি।

মাঝে মাঝেই একটা ঝাঁকুনি লাগছে শরীরে। যেন একটা কিছু দারুণ গোপন ও ভয়ের ব্যাপারের মধ্যে সে ঢুকতে যাচ্ছে। অথচ ফিরতেও পারবে না।

বুধবার দুপুরে মোমিনপুরে অখিলকে অমনভাবে লুকোতে না দেখে ফেললে এ-সব কিছুই হত না। জুলি কাকিমার মৃত্যুর পর যা যা ঘটছিল, তাতে কিছু যেন একটা মিলছিল না।

প্রশান্ত কাকার ওপরে অখিলের কেন এত রাগ? তিনি কোনওক্রমে অখিলের এই দুটো সংসারের ব্যাপার জেনে ফেলেছিলেন? প্রশান্ত কাকা ইদানীং সাড়ে নটা, দশটার সময় বাড়ি ফেরেন। দেখা হয় কদাচিৎ। প্রশান্তকাকা এমনিতেই কম কথা বলেন। যতদূর মনে পড়ছে, শেষ যে-দিন দেখা হয়, সেদিন অখিলও ছিল, প্রশান্ত কাকা তার সঙ্গে কথা বলেননি একটাও।

রঘু নয়, তবে কাকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন জুলি কাকিমা?

বাদাম শেষ হবার পর জহরের ধৈর্যও শেষ হয়ে গেল। এভাবে কয়েক ঘণ্টা বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। নাঃ, বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল।

ট্রাম নিয়ে চলে এল শিয়ালদায়।

একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। বসার জায়গা পাওয়ার লোভে সবাই জোরে পা চালায়। জহর খানিকটা ইতস্তত করে যে ফোন বুথ থেকে ফোন করল শ্রেয়াকে।

—শ্রেয়া, ব্যস্ত ছিলে? আমি জহর।

—হ্যাঁ, পড়াশুনো করাকে ব্যস্ত থাকাই বলে।

—সরি। তুমি সন্ধেবেলা যেতে বলেছিলে, আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সেটা জানাবার জন্যই।

—কেন আসতে পারবে না?

—মানে, সন্ধেবেলা, আমার একটা কাজ আছে বিশেষ।

—তুমি খুব কাজের লোক হয়ে উঠছ দেখছি। বড্ড গোলমাল শুনতে পাচ্ছি, তুমি কোথা থেকে ফোন করছ, অফিস থেকে?

—না, শিয়ালদা স্টেশান।

—সন্ধের তো অনেক দেরি আছে। তুমি এখন একবার আমার বাড়িতে আসতে পারবে?

—তোমার বাড়িতে? তুমি যে বললে, পড়াশুনো করছিলে?

—হ্যাঁ, আমি পড়াশুনো করি, আড্ডাও মারি, গান গাই, নাটকের পার্ট মুখস্ত করি, চলে এসো! তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।

—ওখানে, ইয়ে, মানে, আর কেউ আছে?

—কেন, আমি একা থাকলে তুমি আসতে ভয় পাবে নাকি? ভয়ের কিছু নেই, আরও দু'তিনজন আছে। তোমার সঙ্গে আমি আলাদা কথা বলব। এসো, আমি অপেক্ষা করছি।

জহরকে আর কোনও অজুহাত দেখাবার সুযোগ না দিয়েই ফোন রেখে দিল শ্রেয়া।

না গিয়ে উপায় নেই।

এবারে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেলল।

ইয়ার্কি করেছে শ্রেয়া, আজ তার বাড়িতে অনির্বাণও নেই, কেউ নেই।

শ্রেয়া বলল, ফ্লাস্কে চা বানিয়ে রেখেছি। তুমি খাবে?

জহর মাথা নাড়ল। কিছু বাদাম ছাড়া দুপুরে কিছুই খায়নি, এখন মনে পড়ল।

কাপে চা ঢালতে ঢালতে শ্রেয়া বলল, আজ সকালে অনেকক্ষণ কথা হল নয়নার সঙ্গে। সে তোমাকে দেখতে চায়। তুমি তো তার এক জলজ্যান্ত জ্যাঠতুতো দাদা হও। নয়নার সঙ্গে আলাপ হলে তোমার ভাল লাগবে।

সেইজন্যই আজ সন্ধেবেলা তোমাকে ওখানে আসতে বলেছিলাম।

জহর বলল, কাল যাব। না, বোধহয় কালকেও হবে না। কাল আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হতে পারে।

শ্রেয়া বলল, কেন?

জহর বলল, ইয়ে, অফিসের কাজে।

শ্রেয়া বলল, অফিসের বেশি কাজ পড়ে গেছে বুঝি? তা আর কী করা যাবে। শোনো, প্রশান্ত কাকার নামে পুলিশের কাছে ফোন করে একজন লোক নানা রকম খবর দিচ্ছে, তার নাম জানা গেছে।

জহর চুপ করে চেয়ে রইল।

শ্রেয়া বলল, আজকাল এক রকম গ্যাজেট বেরিয়েছে জানো তো? যাতে, যে টেলিফোন করছে, তার নম্বরটা ফুটে ওঠে? আমাদেরই মধ্যে একজন। কে, তুমি ধারণা করতে পারো?

—পারি।

—কে?

—অখিল।

—তুমি কী করে জানলে?

—অখিল আমার কাছেও প্রশান্ত কাকা সম্পর্কে ওই ধরনের কথা বলেছে।

—কী কী বলেছে?

—সেটা কি তোমার জানা খুব দরকার?

—হ্যাঁ দরকার। দ্যাখো জহর, তোমাকে আমি পছন্দ করি, কারণ তুমি সোজাসুজি কথা বলতে পারো। আমাদের মতন ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি না করে...আমরা ওই গুণটা হারিয়ে ফেলেছি।

—অখিল বলেছে, সোনাগাছিতে প্রশান্তকাকার একটি মেয়ে, রক্ষিতা হিসেবে আছে।

—মাই গড, হোয়াট আ ডার্টি মাইন্ড হি হ্যাজ। যারা সোস্যাল ওয়ার্ক করে, তাদের সম্পর্কে অনেকেই এরকম বদনাম রটায়।

—আমি জানি, কথাটা সত্যি নয়।

—তুমি কী করে জানলে?

—আমি জানি।

—তুমি জোর দিয়ে বলছ, এটাই যথেষ্ট। তা হলে শোনো, অখিলকে আমরা তো সবাই মোটামুটি লাইকেবল পার্সন হিসেবেই মনে করেছি। সব বিষয়েই কিছু কিছু জানে, ইয়ার্কি-ঠাট্টা করতে পারে, একটু আধটু গানও

গায়। নয়না আমাকে বলেছে, অখিল প্রায়ই প্রশান্ত কাকার কাছে টাকা ধার নিয়েছে।

—কত টাকা?

—কখনও পাঁচ, কখনও দশ হাজার। প্রশান্ত কাকার একটা খাতায় সে-সব লেখা আছে। ধার নেয়, শোধ দেয় না।

—জুলি কাকিমার কাছ থেকে নিয়েছে?

—তা জানা যায়নি। উনি তো আর খাতায় লিখে রাখেননি! অখিল তোমার কতদিনের বন্ধু?

—বন্ধু ঠিক বলা যায় কি না জানি না। অনেকদিন আগে আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। তাও বেশিদিন না, এক বছর। তারপর আর বহুদিন দেখা হয়নি, এই জুলি কাকিমার কাছে এসেই নতুন করে পরিচয়।

—গ্রিন হাউজ নামে একটা বার থেকে ও টেলিফোন করে। পুলিশ সেটা ট্রেস করেছে। ও নিয়মিত বারে গিয়ে মদ খায়, ট্যাক্সি ছাড়া চলাফেরা করে না, কিন্তু যতদূর জানা যাচ্ছে, ওর নির্দিষ্ট কোনও আয় নেই।

—ও যে বলেছে, ও অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে?

—ওরকম আর ভেগ্ কথা হয় না। অর্ডার পেলে তবে তো সাপ্লাই করবে! যখন মাসের পর মাস কোনও অর্ডার পায় না, তখন কী করে? এইসব লোকেরা রিস্কি জীবনযাপন করে। আমার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করেছিল, আমি একদিন ওর থুতনি ধরে নেড়ে দিয়েছি। সে যাই হোক, ও যাতে প্রশান্তকাকার বিরুদ্ধে শ্ল্যান্ডারিং বন্ধ করে, সেটা আমাদের দেখতে হবে। অবশ্য পুলিশও ব্যবস্থা নিচ্ছে। তোমাকে আমি ডেকেছি, এই কথাটা বলার জন্য যে তুমি ওর সঙ্গে এখন মিশো না। পুলিশ তা হলে তোমার পেছনেও লাগতে পারে।

—বলা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—আর কোনও কথা নেই। চা খাওয়া হয়ে গেছে। এবার যাই? তুমি পড়াশুনো করবে।

শ্রেয়া হেসে ফেলল।

জহরও হাসল। অখিল সম্পর্কে সে আরও যা জেনেছে, তা সম্ভবত পুলিশও জানে না। শ্রেয়াকে এখন বলে দিলে, তার মুখের অবস্থা কী হবে? না, এখনও বলার সময় হয়নি।

শ্রেয়া বলল, হ্যাঁ, আরও একঘণ্টা কাজ করতে হবে। তার আগে তোমার জন্য আর দশ মিনিট। আমাদের পরিচালক বিপ্লব রায় তোমাকে

একবার দেখতে চেয়েছেন। তুমি কবে দেখা করতে পারবে?

জহর বলল, সেই নাটক? আমি নৈহাটিতে থাকি, মফস্বলের মানুষ, কলকাতায় এসে নিয়মিত রিহার্সাল দেব কী করে?

শ্রেয়া বলল, বিপ্লবদা থাকেন ব্যারাকপুরে।

—তিনি নিশ্চয়ই আমার মতন কারখানায় কাজ করেন না?

—না, উনি কলেজে পড়ান।

—তার মানে উনি একজন আঁতেল। আমি মিস্তিরি। আমার পক্ষে কি ও-সব সম্ভব?

—আমরা আঁতেল চাইছি না। তোমার মতন একজন স্ট্রেট ফরোয়ার্ড মানুষ চাইছি। দেখো জহর, বারবার নিজেকে মিস্তিরি মিস্তিরি বলে অহংকার দেখিয়ো না। আমরা মিস্তিরি না হয়ে কী এমন দোষ করেছি? কিংবা, যে যা কাজ করে সবাই সেই কাজের মিস্তিরি।

—এ-সব বড় বড় কথা আমি ঠিক বুঝি না।

—মোটেই বড় বড় কথা নয়। কারখানার কর্মীরাও পড়াশুনো করতে পারে। নাটক করতে পারে। ইচ্ছে করলে সবকিছুই পারে।

—আমরা কী ধরনের পরিবারে থাকি, কী ধরনের পরিবেশে থাকি, সে সম্পর্কে তোমার কোনও জ্ঞানই নেই শ্রেয়া।

—তুমি হঠাৎ রেগে রেগে কথা বলতে শুরু করলে কেন? তুমি কাকিমার ওখানে যেমন আসতে, সেরকম মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা রিহার্সাল দিতে আসতে পারবে না?

—আমি রেগে রেগে কথা বলছি? আজকে কেমন যেন মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি বলছ, আমার দ্বারা ওরকম নাটকে অভিনয় করা সম্ভব?

—তোমার দ্বারা অনেক কিছুই সম্ভব। মানুষ যে যা পরিবেশে থাকে, তার থেকে একটু উঁচুতে ওঠার চেষ্টা করাটাই সভ্যতা। এটা বুঝলে, না এটাও বড় বড় কথা?

—আমাকে অনেক কিছুই শেখাতে হবে, শ্রেয়া।

—দশ মিনিট হয়ে গেছে, এবার কাটো। কাল কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। ফিরেই ফোন করবে আমাকে। তোমার কাছে সিগারেট আছে? একটা দিয়ে যাও আমাকে।

বাইরে বেরিয়ে জহর বুক ভরে দু'বার নিশ্বাস নিল। দুপুর পর্যন্ত কেমন যেন একটা দমবন্ধ ভাব ছিল, এখন ভেতরটা পরিষ্কার লাগছে বেশ।

নয়

খুব ভোরের ট্রেন ধরে আসানসোল পৌঁছোনো যায় সাড়ে আটটার মধ্যে। অখিল বলেছিল, আসানসোলে সে অটোয়ালদের হোটেলে ওঠে। জহর একবার এখানে এসে হোটেলটা দেখেছিল। এখন আরও বাড়িয়েছে। হ্যাঁ, ঘর পাওয়া যাবে।

হেটেলের রেজিস্ট্রারে নাম লিখতে গিয়ে জহর আগেকার কয়েকটা পাতা উল্টে দেখল। অখিল সেনগুপ্তর নাম আছে।

বুধবার বারো তারিখ, বৃহস্পতিবার তেরো।

অখিলের নামের পাশের তারিখটা কয়েকবার কাটাকুটি করে, মোটা করে বারো লেখা। তার আগে আর তিনজনের তেরো তারিখ। অখিল এটা লক্ষ করেনি? আগের তিনজন তেরো তারিখে নাম লেখালে পরে একজন বারো তারিখে আসে কী করে? বারো তারিখ দুপুরে অখিলকে মোমিনপুরে দেখেছে জহর।

তেরো তারিখ সকালে এখানে পৌঁছেই অখিল ফোন করেছিল থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে। বারো তারিখ রাত্তিরে তা হলে সে ছিল কোথায়?

কাউন্টারের ম্যানেজারকে সে গল্পচ্ছলে বলল, আমার এক বন্ধু দিনকয়েক আগে এখানে থেকে গেছেন। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

লোকটি মাথা নাড়ল।

জহর বলল, মানি ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছিলেন?

লোকটি বিরক্তভাবে বলল, সে-সব কিছু শুনিনি। আমাদের এখানে কিছু হয়নি। উনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

চাবি নিয়ে ওপরে উঠে এসে ঘর খুলল। তারপর দরজা বন্ধ করেই বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল জহর। এই প্রথম জুলি কাকিমার জন্য সে সমস্ত প্রাণ খুলে কাঁদছে।

সমস্ত ছবিটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে।

অখিলই এই কাণ্ডটি করেছে। থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাট বাড়িতে সে যখন তখন যায়। লিফটম্যানরা কখন থাকে, না থাকে সে ঠিক জানে। জুলি কাকিমা তাকে তো দরজা খুলে দেবেনই।

কিন্তু জুলি কাকিমাকে মারল কেন? টাকার জন্য? সব মিলিয়ে দু'লাখ টাকাও নয়, সেটা জুলি কাকিমার প্রাণের দাম?

কিংবা ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছে?

তা হলে আগে থেকেই আসানসোল যাওয়ার কথা রটিয়ে ছিল কেন?

নিজের স্ত্রীকেও সে কথা বলে বেরিয়ে এসেছে। এমনিই ওরকম কথা বলে মাঝে মাঝে মোমিনপুরের মেয়েটির সঙ্গে রাত কাটায় হয়তো। যার উপার্জনের ঠিক নেই, সে ওরকম একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কী করে?

মার্কামারা কোনও ডাকাত বা খুনি এরকম কাজ করলে তার দুঃখ একরকম। আর নিজেদেরই মধ্যে একজন, যাকে সবাই বন্ধু বলে মনে করে, যাকে জুলি কাকিমা এত বিশ্বাস করতেন, সে এরকম কাজ করলে যে ব্যথার অবধি থাকে না।

অখিল তো শুধু জুলি কাকিমাকেই খুন করেনি, সে জহরেরও নিদারুণ ক্ষতি করেছে। জহর এক নতুন ধরনের জীবনের সন্ধান পেয়েছিল, সেটাকেও ধ্বংস করে দিল অখিল। নিজেকে নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও অন্যভাবে তৈরি করতে চেয়েছিল জহর, ওই শ্রেয়া যেমন বলল, নিজের পরিবেশ ছাড়িয়ে খানিকটা ওপরে ওঠা, আর কি সে তা পারবে? তার মনটাই যে অবশ হয়ে গেছে!

জহর এখন কী করবে?

অখিলের মতন মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। পাগলা কুকুরের মতন পিটিয়ে মারলেই ওর ঠিক শাস্তি হয়।

তা না হোক, ফাঁসিই যথেষ্ট। জহর যদি সিরাজুল তারিখকে অখিলের মোমিনপুরের আস্তানা আর আসানসোল হোটেলে তারিখের কারচুপির কথা জানিয়ে দেয় তা হলেই পুলিশ জাল গুটিয়ে ফেলবে। মোমিনপুরের মেয়েটিকে খুব কড়া ধাতের মনে হয়নি। ভাল মতন জেরা করলে অনেক কিছু বলে ফেলতে পারে।

জহর ফুলে ফুলে কাঁদছে, আবার এইসব কথাও ভাবছে। আর মাঝে মাঝে চোখে ভেসে উঠছে জুলি কাকিমার প্রস্ফুটিত পদ্মের মতন মুখখানি।

একটা সর্বনাশ আরও কত সর্বনাশ ডেকে আনে। অখিলের ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবেই। তখন মোমিনপুরের মেয়েটির ভাগ্যে কী ঘটবে? সে হয়তো একটি নিরীহ, অসহায় মেয়ে। অখিল তাকে কোথা থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনেছে কে জানে! আর যদি তার ঘর থেকে চোরাই গয়না কিছু উদ্ধার হয়, তা হলে পুলিশ তাকেও ছাড়বে না।

অখিলের স্ত্রী জয়া, ওদের দুটি মেয়ে। জয়াকে দেখে মনে হয়, মনের জোর আছে। মেয়ে দুটি জানবে, তাদের বাবা খুনি? নিছক টাকা আর গয়নার লোভে একজন নিষ্পাপ মানুষকে খুন করেছে, এমন একজন মানুষ, যিনি সবাইকে বিশ্বাস করতেন, মোমিনপুরের মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্কের

কথাও ফাঁস হয়ে যাবে। মেয়ে দুটি এই কলঙ্কের বোঝা বইবে সারা জীবন!

এই খুন সম্পর্কে সব খবরের কাগজ অতি আগ্রহী। খবরে খবরে ছয়লাপ হয়ে যাবে। এমনকী অখিলের মেয়ে দুটির ছবিও ছাপা হয়ে যেতে পারে। এইসব ব্যাপারে সাংবাদিকদের কোনও মায়া দয়া নেই।

সেদিন অখিলের বাড়িতে গিয়ে মনে হয়েছিল, মেয়ে দুটি বাবাকে বেশ ভালবাসে। বাবার মাতলামি পাগলামির প্রশ্রয় দেয়। নিশ্চয়ই অখিলও তেমনই স্নেহ দিয়েছে মেয়ে দুটিকে, বাড়ির মধ্যে হয়তো সে ভাল স্বামী, ভাল বাবা। যে মানুষের অমন সন্তান থাকে, সেই মানুষ অন্য একজনকে খুন করে কী করে? যাঁকে খুন করেছে তিনিও তো দুটি মেয়ের মা।

অখিলের বড় মেয়ে কেয়ার বয়েস তো চোদ্দো হবে। কিংবা একটু কম। ওই বয়েসটা সাঙ্ঘাতিক, ওই বয়েসের ছেলে-মেয়েরা যখন তখন আত্মহত্যা করে ফেলে। জহরদেরই পাড়ার একটি মেয়ে মাত্র ক্লাস নাইনের পরীক্ষায় ফেল করে গায়ে আগুন লাগিয়েছিল, বাঁচেনি।

জহর স্পষ্ট দেখতে পেল, ফ্রক-পরা কেয়া, তার সারা গায়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

দু'হাতে চোখ চাপা দিল সে।

যদি সত্যিই সে রকম কিছু হয়, তার জন্য কি জহরই দায়ী হবে? সে না জানালে হয়তো পুলিশ আসানসোলের এই হোটেলে আসবে না। মোমিনপুরে মেয়েটির সন্ধান জানবে না। কত খুনের ব্যাপারই তো শেষ পর্যন্ত চাপা পড়ে যায়। আর একটা রোমহর্ষক খুন হয়, আগেরটা ভুলে যায় সবাই। আগের খুনি ধরা পড়ল কি পড়ল না, তারই বা কে খবর রাখে।

তা হলে কি জহর হাত গুটিয়ে নেবে?

যা হয়ে গেছে তা তো আর ফেরানো যাবে না, এখন অনেকগুলো জীবনকে বিড়ম্বিত করার কী দরকার।

পুলিশ যদি বেশি মাথা না ঘামায়, তা হলে অখিল আবার স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে? যদি এ রকম একটা কাণ্ড আবার করে? একবার ছাড় পেয়ে গেলে ওর সাহস বেড়ে যেতে পারে। সে যাই হোক, তাতে তো জহরের কোনও দায়িত্ব থাকছে না। অখিলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখবে না সে।

জুলি কাকিমার মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য শাস্তি পাবে না খুনি?

ঠিক এই রকমই একটা ঘটনা শুনলে জুলি কাকিমা নিজে কী বলতেন? কী বলতেন মহাত্মা গান্ধী? তিনি কি খুনিকে শাস্তি দেবারও বিরোধী ছিলেন?

কী বলতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? কী বলতেন নেতাজি?

জহরের অত পড়াশুনো নেই। সে ওঁদের মতামত জানে না।

শ্রেয়া কী বলছ?

শ্রেয়া যে রকম তেজি, ও নিশ্চয়ই ক্ষমার কথা উচ্চারণ করবে না। যে নাটকটায় ও অভিনয় করছে, সেখানে একজন অত্যাচারী, বদমাশ জোতদারকে খুন করার কথা বারবার বলেছে সে।

শ্রেয়া তো অখিলের বউ আর মেয়ে দুটিকে দেখেনি। সে শুধু অখিল নামে একটি ভণ্ড, দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর মানুষকে চিনবে, যার সম্পর্কে দয়া-মায়া দেখাবার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু সেই লোকটি দুটি মেয়ের বাবা। যে মেয়েরা কোনও অপরাধ করেনি। অখিলকে শাস্তি দিলে তাদের জীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলা হবে।

শ্রেয়ার বিয়ে হয়নি। সে অতটা বুঝবে না। কিন্তু জহরের ছেলেমেয়ে আছে, সে কী করে অন্যের ছেলেমেয়েদের এমন কঠিন শাস্তি দেবে।

হোটেলের কাউন্টারে যখন ম্যানেজার থাকবে না, তখন অখিলের নামের আগের তিনজন লোকের তেরো তারিখগুলো সাবধানে বারো তারিখ করে দিলে অখিল বেঁচে যেতে পারে। বারো তারিখ সে কলকাতার বাইরে ছিল, এটা প্রমাণ হলেই তাকে আর কেউ ছুঁতে পারবে না। গয়নাগুলো নিজের বাড়িতে রেখে দেবার মতন বোকামি সে নিশ্চয়ই করেনি।

জহর না বলে দিলে মোমিনপুরের মেয়েটির সন্ধান পাওয়া পুলিশের পক্ষে বোধহয় সম্ভব নয়।

বিছানায় হাঁটু গেড়ে বসে, হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে লাগলে, হে ভগবান, আমি কী করব, বলে দাও। কেন আমাকে এর মধ্যে জড়ালে? কেন আমি মোমিনপুরে সেদিন অখিলকে দেখলাম? কেন আমাকে আসানসোলে টেনে আনলে?

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলে শরীর দুর্বল লাগে, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। জহর ঘুমিয়ে পড়ল, আগের রাতে সে বিছানায় ছটফট করেছে, তাই ঘুম হল প্রগাঢ়।

সন্ধের একটু আগে ধড়মড়িয়ে উঠে সে ভাবল, আসানসোলে কী করছে সে? তাকে বাড়ি ফিরতে হবে না?

তখনই বিল মিটিয়ে হোটেল ছেড়ে সে ছুটল স্টেশনের দিকে। ট্রেনটা চলছে ধিক ধিক করে। কখন হাওড়ায় পৌঁছবে কে জানে? তারপর কি শিয়ালদা থেকে ট্রেন পাওয়া যাবে?

বসার জায়গা পায়নি, দাঁড়িয়ে আছে জহর।

ঠিক তার গা ঘেঁষে যে মাঝবয়েসী লোকটি রয়েছে, সে মাঝে মাঝে কী যেন বিড়বিড় করছে আপনমনে। অথচ পাগল নয়। এরই মধ্যে একবার শসা কিনে খেল, শসাওয়ালার সঙ্গে কথা বলল বেশ স্বাভাবিকভাবে। তার একটু পরেই শুরু করল আপন মনে কথা বলা, খুব আস্তে, নিজের সঙ্গে। জহর লক্ষ করল, সেই সময় লোকটির চোখদুটি কুঁচকে যাচ্ছে, ঠোঁটের পাশে ফুটে উঠছে স্পষ্ট বেদনার রেখা।

এই লোকটির মনের মধ্যে কী চলছে, তা আর কেউ জানে না। যেমন, ওই লোকটিও ভাল করে দেখছে না জহরকে। এই কামরায় এতগুলো মানুষ, প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা জগৎ আছে। প্রত্যেকের মনেই হয়তো এমন কিছু কথা আছে, যা অন্য কাউকেই বলা যায় না। কেউ হয়তো প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবছে, কেউ ভাবছে ক্ষমার কথা। ট্রেন-ডাকাতরাও তো সাধারণ যাত্রী সেজে বসে থাকে, পাশের লোকটির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, দেশলাই চাইলে দেয়, সর্ষের তেলের দাম বাড়া বিষয়ে একমত হয়, তারপর একটু পরেই তারা ডাকাত সেজে ভোজালি বা পাইপগান দিয়ে সেই সহযাত্রীকে মারতে যায়।

মানুষের মনের কোনও ছবি ওঠে না। যদি উঠত, তা হলে কি পৃথিবীতে সব মারামারি, খুনোখুনি বন্ধ হয়ে যেত? আর কি কেউ কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারত?

কামরার সব লোকগুলির মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে জহর ভাবল, তাদের মনের মধ্যে যাই-ই হোক, তার চেয়ে বেশি কষ্ট এখন আর কেউ পাচ্ছে না। তার বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।

অখিলকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না। আবার অখিলকে সে ধরিয়ে দিলে তার মেয়ে দুটির জন্য সারাজীবন অপরাধী হয়ে থাকবে।

সে কি তবে চুপ করে থাকবে? পুলিশ যা পারে করুক, পুলিশের ওপর তো তার কোনও হাত নেই। পুলিশ যদি অখিলকে ধরতে পারে, তাতে জহরের বিবেকের কোনও দায় থাকবে না।

পুলিশ যদি আর কিছুই না করে? যদি ধামাচাপা দিয়ে দেয়? তখনও কি জহরের বিবেক দংশন হবে না? হে ভগবান, এই রকম সময় পথ দেখাও না কেন?

হাওড়া পৌঁছে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি পেয়ে গেল শিয়ালদা পর্যন্ত। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি নেমেছে, রাস্তাঘাট ফাঁকা। ভাগ্যিস সেই জন্য ট্যাক্সিটা এল খুব তাড়াতাড়ি, প্ল্যাটফর্মে এসে দেখল, লাস্ট ট্রেন গা মোচড়াচ্ছে।

জহর দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল। শেষ কামরায়।

অন্য দিন সব কামরাতেই দু'একজন চেনা লোক থাকেই। আজ কেউ নেই। তাতে একটা সুবিধে হল, জহরকে কথা বলতে হবে না। এখন কোনও কথা বলারই ক্ষমতা তার নেই।

হঠাৎ একটা কথা তার মনে এল।

জহর সরকার নামে যে আর একজন লোক আছে, সরকারের বড় অফিসার, তিনি এই অবস্থায় পড়লে কী করতেন? একই নামের দু'জন মানুষ, দু'জনের চিন্তাধারা কি আলাদা? সেই জহর সরকারের কাছে গিয়ে সব ব্যাপারটা খুলে বলে, তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?

হয়তো তিনি দেখাই করবেন না। হোমরা-চোমরা, ব্যস্ত মানুষ, শুধু নামের মিলটা গ্রাহ্য করবেন কেন?

আর কে আছে?

জুলি কাকিমার মুখটাই মনে পড়ছে বারবার। একমাত্র জুলি কাকিমাই ঠিক উত্তর দিতে পারতেন। জুলি কাকিমা, জুলি কাকিমা, আপনারা কেন কলকাতায় এলেন? এ শহরটা আর ভাল নেই একেবারে!

নৈহাটিতে নামল আরও চার-পাঁচজন যাত্রী। এখানে বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরে। কতক্ষণ বৃষ্টি শুরু হয়েছে কে জানে। একটাও সাইকেল রিকশা নেই। এত ক্লান্ত লাগছে যে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করছে না, অপেক্ষা করারও কোনও মানে হয় না।

জহর হাঁটিতে লাগল।

বাজার এলাকা ছাড়াবার পর রাস্তা একেবারে নির্জন। বৃষ্টি মাঝে মাঝে বাড়ছে, মাঝে মাঝে একটু কমছে। এই একই রাস্তায় প্রতিদিন যাওয়া আসা, প্রতিটি দোকানের সাইনবোর্ড মুখস্ত। অন্যান্য দিন দূরত্বটা খেয়ালই থাকে না। আজ মনে হচ্ছে রাস্তা অনেকখানি।

হঠাৎ একদিকের অন্ধকার থেকে ছুটে এসে একটা লোক লাফিয়ে পড়ল জহরের ঘাড়ে। তার হাতের ছুরিটা দিয়ে সে কোপ বসাল বটে, কিন্তু ঠিক জায়গায় লাগাতে পারল না, জহরের বাঁ কাঁধ ঘেঁষে গেল।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল জহরের, তারপরই লোকটিকে মাটিতে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে ছুটল।

লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে তেড়ে এল আবার।

রাস্তা খানাখন্দে ভরা, জোরে দৌড়ানো অসম্ভব। ওই অবস্থাতেও জহর ভেবে নিল, সে যদি একবার আছাড় খেয়ে পড়ে, তা হলে নির্ঘাত ছুরি খেয়ে মরতে হবে।

লোকটা আবার ধরে ফেলল জহরকে। এবারেও ছুরিটা ঠিক মতন বসাতে পারছে না। জড়াজড়ি, ঝটাপটি করতে করতে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিতে সমর্থ হল জহর।

এবার সে দৌড়োতে দৌড়োতে চেঁচাতে লাগল, বাঁচাও, বাঁচাও।

বৃষ্টি-ভেজা মাঝ রাতে নিশ্চিত বিছানা ছেড়ে কে একটা উটকো লোককে বাঁচাবার জন্য রাস্তায় বেরুবে? পাগল নাকি! গুণ্ডারা ক'জন, সঙ্গে বোমা-পিস্তল আছে কি না কে জানে!

জায়গাটা ফাঁকা। যে-ক'টা বাড়ি আছে, বৃষ্টির জন্য জানলা বন্ধ। যে ক'জন জহরের আর্ত চিৎকার শুনল, তারা কেউ জানলা খুলল না। এ-সব ব্যাপার দেখে ফেললেও পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হয়।

লোকটি কিছুতেই ছাড়ছে না। একবার না একবার সে পেছন থেকে জহরের কাঁধে মোক্ষম কোপ বসাবেই।

খানিকটা এগিয়ে গিয়েও জহর থমকে দাঁড়াল। সে মন ঠিক করে ফেলেছে। মৃত্যুকে সে মুখোমুখি দেখতে চায়। এখন তার মরে যাওয়াও এক হিসেবে ভাল। সব অশান্তি ঘুচে যাবে।

লোকটি ছুরি উঁচিয়ে তেড়ে আসতেই জহর নিছক স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় তার ছুরিসমেত হাতটা চেপে ধরল। লোকটি বেশ শক্তিশালী, কিন্তু জহরের গায়ে এখন যেন অসুরের জোর। সে দমাস করে একটা ঘুষি কষাল লোকটার মুখে। তারপর তাকে মাটিতে ফেলে হাত দিয়ে, পা দিয়ে মারতে লাগল অনবরত।

একটু পরেই রণে ভঙ্গ দিল আততায়ী। হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে খানিকটা সরে গিয়ে দৌড় লাগাল ল্যাজ গোটানো কুকুরের মতন।

ছুরিটা ফেলে গেছে।

আবছা অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্যেও চকচক করছে ছুরিটা। জহর সেটা তুলল না, চেয়ে রইল সেই দিকে।

লোকটি আবার দলবল নিয়ে ফিরে আসতে পারে, সে চিন্তাও মনে এল না তার। বাড়ি ফেরার কথাও যেন ভুলে গেছে। একদৃষ্টিতে ছুরিটার দিকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

দশ

ভোর থেকে ফুলবাগানের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে জহর।

তার বাঁ কাঁধে একটা ব্যান্ডেজ আছে, কিন্তু সেটা পাঞ্জাবির তলায় ঢাকা,

দেখা যাচ্ছে না। আঘাতটাও বেশি না।

ফুটপাথে একটা ঝুপড়ির চায়ের দোকান। বেশ সকাল সকাল উনুন ধরিয়েছে, চা ফুটছে। কুলি-মজুররা এখানে চা খায়, জহর এর মধ্যে খেয়েছে তিন ভাঁড়।

ঠিক আটটার সময় গলি থেকে বেরিয়ে এল অখিল।

পা-জামা, পাঞ্জাবি পরা, হাতে একটা প্লাস্টিকের থলে। দেখলেই বোঝা যায়, বাজার করা বাবু। মফস্বলের বাবুরা এখনও অনেকে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে বাজারে যায়, শহরে সে পোশাকের চল নেই।

কেমন দায়িত্বশীল পারিবারিক মানুষ অখিল। কাজের লোক না পাঠিয়ে নিজে বাজার করে। স্ত্রী, সন্তানেরা কী কী খেতে ভালবাসে, সেইসব কিনবে। মোমিনপুরে যখন রাত্রিবাস করে, তখনও কি সেখানকার বাজারে যায়?

সিগারেটটা ফেলে জহর ফুটপাথের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল, যাতে অখিল তাকে মুখোমুখি দেখতে পায়।

অখিল চমকে উঠল কি না, তা বোঝা গেল না তার মুখ দেখে। ভয় পাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন প্রকাশ্য দিবালোকে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে দেখে ভয় পাবে কেন? তা ছাড়া জহরের এলেম কতখানি, তা অখিলের জানা আছে।

মুখে হাসি এনে সে বলল, কী রে, তুই এখানে? কোনও কাজে এসেছিলি বুঝি?

জহর উত্তর দিল না।

অখিল বলল, আজ তো সেই স্মরণসভা। ক'টায় শুরু হবে, দশটায়? ঠিক আছে, আমি বাজারটা সেরে নিই, তারপর দু'জন একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

জহর বলল, সে সভায় তোর যাওয়া হবে না।

অখিল বলল, যাওয়া হবে না মানে?

জহর বলল, সেখানে তোর যাবার দরকার নেই।

অখিল ভুরু তুলে শ্লেষের সঙ্গে বলল, আমি কোথায় যাব, না যাব, তুই ঠিক করবি নাকি?

জহর বলল, অখিল, কাছেই একটা পার্ক আছে, আমরা সেখানে একটু বসব।

অখিল বলল, পার্কে বসব? আমায় বাজার করতে হবে। এখন সময় নেই।

অখিলের কাঁধে হাত রেখে শান্ত, কঠিন গলায় জহর বলল, অখিল, এখন আমরা পার্কে গিয়ে বসব। জরুরি কথা আছে।

কাঁধ শ্রাগ করে অখিল বলল, ঠিক আছে, তুই বলছিস যখন। বেশিক্ষণ না কিন্তু।

পার্কটা খুবই কাছে।

সেদিকে যেতে যেতে অখিল বসল, দু'তিনদিন আগে তোকে নাকি নৈহাটিতে গুণ্ডারা অ্যাটাক করেছিল? নৈহাটিতে বাড়ি করেছিস, ওখানে তো গুণ্ডা, স্মাগলার-ফাগলার থাকে। তুই যে সেই আমার হয়ে একটা স্মাগলাকে তড়পেছিলি, তোকে বলেছিলাম না, ওরা রাগ পুষে রাখে। সে-ই হয়তো তোকে মারবার জন্য গুণ্ডা লাগিয়েছিল। তোর বেশি লাগেনি তো?

জহর বলল, কে গুণ্ডা পাঠিয়েছিল আমি জানি। আমাদের মতন মিস্তিরি-মজুরদের খুব কড়া জান হয়, সহজে মরি না। যাই হোক, এতে আমার উপকারই হয়েছে।

—উপকার হয়েছে?

—হ্যাঁ।

পার্কটি ছোট, এখন বিশেষ লোকজন নেই। ওরা মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে ঘাসের ওপর বসল।

সিগারেট ধরিয়ে অখিল জিজ্ঞেস করল, বল কী ব্যাপার?

তখনই কোনও উত্তর না দিয়ে অপলকভাবে চেয়ে রইল জহর।

অখিল বলল, জহর, তুই যে জায়গায় আছিস, সেখানেই থাক। আগুন নিয়ে খেলা করতে যাস না। ও-সব তোদের মতন মানুষের জন্য নয়।

জহর তবুও চুপ।

গলার মোলায়েম ভাবটা মুছে দিয়ে এবারে কর্কশ গলায় অখিল বলল, তুই মোমিনপুরে করবীর কাছে কী খোঁজ নিতে গিয়েছিলি? আমার প্রাইভেট ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার তোকে কে দিয়েছে?

জহর এবার আস্তে আস্তে বলল, আমি আসানসোলের হোটেলটাতেও গিয়েছিলাম।

হঠাৎ যেন অখিল বুকে একটা ধাক্কা খেল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য পাংশু হয়ে গেল মুখ। তবু সামনে নিয়ে বলল, আসানসোলে? সেখানে কী আছে?

জহর বলল, তুই সবাইকে বলেছিস, মঙ্গলবার আসানসোল গিয়ে বেস্পতিবার ফিরে এসেছিস। কিন্তু আমি জানি, তুই বুধবার ছিলি

কলকাতায়। আমি নিজের চোখে তোকে দেখেছি মোমিনপুরে।

—সো হোয়াট? আমি যতবার ইচ্ছে আসানসোল যেতে পারি, ফিরে আসতে পারি।

—সন্ধেবালা তুই গিয়েছিলি থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে।

—সেটাও তুই দেখেছিলি নাকি? ননসেন্স।

—তুই এ কাজ কেন করলি অখিল?

—এ কাজ মানে?

—কেন করলি অখিল?

—কী করেছি?

—কেন করলি অখিল?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, মাটি থেকে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে অখিল বলল, ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছি। ভুল করেছি। দারুণ অন্যায় করেছি। কিন্তু হয়ে গেছে, কী করা যাবে!

—কী করা যাবে?

—হ্যাঁ, এখন আর কী করা যাবে? জুলি বউদি আমার একটা অনুরোধ রাখতে চাইল না কিছুতেই। এত করে বললাম। অথচ, জুলি বউদি আমার সঙ্গে প্রেম করতে রাজি ছিল, তুই জানিস?

জহর বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে অখিলের কলার চেপে ধরে বলল, জুলি কাকিমা সম্পর্কে একটা খারাপ কথা বলবি তো তোর দাঁত ক'খানা এক্ষুনি খসিয়ে দেব!

রাগ সামলাতে জহরের দু'তিন মিনিট সময় লাগল।

তারপর জিজ্ঞেস করল, কী অনুরোধ করেছিলি?

—এক লাখ টাকা। মাত্র এক লাখ টাকা। ওদের কাছে সেটা কিছু না। তবু দিতে রাজি হল না।

—এক লাখ টাকার জন্য?

—জহর, আমি খুনি নই। এর আগে কোনও মানুষকেই মেরে ফেলার কথা ভাবিওনি। আমাকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল।

—তোকে কেউ খুন করতে পাঠিয়েছিল?

—ঠিক সে রকম নয়। আমি একটা র‍্যাকেটে জড়িয়ে পড়েছি। এক লাখ টাকা পেমেন্ট করতে পারছিলাম না। ওরা ডেঞ্জারাস পার্টি, ঠিক ঠিক তারিখে টাকা পেমেন্ট না করলে ওরা গলা কেটে দিতে পারে। আমাকে তিনদিন সময় দিয়ে বলেছিল, যেমন ভাবে পারো টাকা জোগাড় করে আনো। টাকা না আনলে ওরা আমাকেই খুন করত।

—সেই জন্য তুই জুলি কাকিমাকে

—টাকা দেবার মতন পার্টি আর তো কেউ ছিল না। মারতে কি চেয়েছি? টাকাটা দেবার জন্য আমি ওর পায়ে ধরেছিলাম পর্যন্ত।

—পায়ে ধরেছিলি, না রেপ করতে গিয়েছিলি?

—বাজে কথা। ওকে রেপ বলে না। আমি ভেবেছিলাম, প্রশান্তদার সঙ্গে বউদির সে রকম সম্পর্ক তো আর নেই, অনেকদিন আদর-টাদর পান না। আমি আদর করলে উনি গলে যাবেন। কিন্তু আমি জড়িয়ে ধরতেই উনি ন্যাকামি করে ছি ছি বলতে লাগলেন। তাতে আমার হঠাৎ রাগ চড়ে গেল।

—এর ফলে কী হবে, তুই ভাবিসনি?

—দ্যাখ জহর, ওই কাজটা করে ফেলার পর আমার কষ্ট কম হয়নি। অনুতাপ হয়েছে প্রচণ্ড। কিন্তু আমি সেই টাইপ নই যে অনুতাপের চোটে আত্মহত্যা করব কিংবা পুলিশের কাছে ধরা দেব। আমাকে বাঁচতে হবে। আমি অনেকের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছি। আমার মেয়ে দুটোকে মানুষ করতে হবে। তাই বাঁচার জন্য বেপরোয়া হয়ে আমাকে যদি আরও দু'একটা ওই কাজ করতে হয়, তাতেও আমি পেছ্-পা হব না।

—তুই আরও খুন করবি?

—জহর, আমি তোকে স্পষ্ট কথা বলছি, প্রধান সাক্ষী তুই। আমাকে যদি পুলিশে ধরে, তা হলে তুই যাতে সাক্ষী দিতে না পারিস, তাই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা আছে। সেই জন্যই বলছিলাম, তুই আগুন নিয়ে খেলিস না। সরে দাঁড়া। নৈহাটিতে আছিস, সেখানেই থাক।

—তোর ওই ছেঁদো কথায় আমি ভয় পাব ভেবেছিস? আমি যদি এক্ষুনি পুলিশের কাছে যাই, তোকে যে কী করবে? তোর ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারি।

—আমাকে ধরিয়ে দিয়ে তোর কী লাভ হবে? তুই যদি চাস

—তোর মতন মানুষরা সব সময় লাভ লোকসানের কথা ভেবে কথা বলে। আমি তা ভেবে আসিনি। আমি এসেছি তোকে বাঁচাতে।

—আমাকে বাঁচাতে? কী ভাবে।

—তুই এখান থেকে চলে যা।

—চলে যাব? কোথায় যাব?

—যেখানে ইচ্ছে। এখান থেকে অনেক দূরে। তুই দূর হয়ে যা, তুই হারিয়ে যা, তুই জাহান্নমে যা, তোর ওই বীভৎস মুখ যেন এখানে আর

কেউ না দেখে। তোর বউ, মেয়েরা না দেখে। প্রশান্ত কাকা, তার মেয়েরা না দেখে। কেউ না দেখে। বিদায় হ। দূর হয়ে যা।

—আস্তে, আস্তে, চেঁচাচ্ছিস কেন? আমি চলে গেলে কী সুরাহা হবে?

—তোর বাড়ির লোকেরা জানবে, তুই হারিয়ে গেছিস। নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিস। কেউ তোকে গুম-খুন করেছে। কিন্তু তোকে খুনি ভাববে না। তোর মেয়ের খুনির মেয়ে হয়ে থাকার কলঙ্ক মাথায় বয়ে বেড়াবে না। তোর বউ চাকরি করে, ওরা কোনও রকমে খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে!

—চলে যাব? হয়তো আমার এ রকম মুক্তির দরকার!

—তুই আমাকে বলেছিলি, নতুন জীবন শুরু করতে গেলে বউ-ছেলে-মেয়ে, সংসার ছাড়তে হয়, চাকরি ছাড়তে হয়। খাওয়া-পরা ঠিক জুটে যায়। তুই এবার সেটা শুরু কর।

—কোথায় যাব।

— সেটাও কি আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? বাংলার বাইরে, যাতে এখানকার পুলিশ তোর খোঁজ না পায়। ওই শখের দাড়ি কামিয়ে ফেলবি, কিংবা চাপদাড়ি রাখবি। ভুরু কামিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে, যেভাবে হোক, ওই খুনি মুখখানা মুছে ফ্যাল!

—ঠিক আছে, ভেবে দেখি।

—ভেবে দেখোদেখির কিছু নেই অখিল। শোন, আমি এসেছি, তোকে আলটিমেটাম দিতে। দুটোই রাস্তা। হয় তুই আজই, এক্ষুনি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবি, নয়তো তোকে সারাজীবন জেলে কাটাতে হবে। কিংবা যদি ফাঁসি হয়—সত্যি সত্যি তুই যদি তোর মেয়েদের ভালবাসিস, তা হলে তোর সরে পড়াই উচিত। ওঠ, ওঠ, উঠে পড়।

—এত হুড়োহুড়ি কীসের? বাজারটা করে দিয়ে আসি

—বাজার? মাথা খারাপ নাকি? সে প্রশ্নই ওঠে না।

—ওরা যে চিন্তা করবে, অপেক্ষা করে থাকবে।

—ওরা সারাজীবন অপেক্ষা করবে। তুই বাজার করতে গিয়ে হারিয়ে গেছিস, এটাই হবে একটা ধাঁধা।

—তা হলে একবার অন্তত বাড়ি ঘুরে আসি।

—নাঃ! বিদায় নেওয়া, হাত জড়িয়ে ধরা, কান্নাকাটি, ও-সব নাটক একেবারে চলবে না। ওরা যত কম জানে, ততই ভাল। ওরা অন্ধকারে থাকুক। রহস্য নিয়ে থাকুক। অনেক বছর তোর মেয়েরা আশা করবে, বাবা আমার ফিরে আসবে যে-কোনওদিন। তোর বউও নিশ্চয়ই ভাববে। এই আশাটাই ওদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে।

—বাড়িতে একবার অন্তত না গেলে ... টাকা পয়সা নিতে হবে না? মাত্র দেড়শো টাকা নিয়ে বেরিয়েছি।

—কিচ্ছু নেওয়া চলবে না। তুই যে বলেছিলি, খাওয়া-পরার জন্য চিন্তা করতে হয় না?

—ওটা কথার কথা।

—আমার ব্যাঙ্কে বাইশশো টাকা ছিল। কাল তুলে নিয়েছি। এর বেশি আর আমার সাধ্য নেই। এটা নিয়ে চলে যা

—জহর, তুই আমাকে টাকা দিচ্ছিস?

—না, আমি তোকে টাকা দিচ্ছি না।

—তবে?

—তোর হাতে টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তোকে দিচ্ছি না।

—তার মানে বুঝলাম না।

—তুই বুঝবিও না। শুয়োরের বাচ্চা, তুই কোনওদিন বুঝবি না। তোর তা বোঝার ক্ষমতাই নেই। ওঠ, ওঠ, আর এক মিনিটও এই শহর নোংরা করবি না। আর তোকে দেখতে ইচ্ছে করছে না। দূর হয়ে যা।

—চ্যাঁচাসনি। লোকে শুনতে পাবে।

জহর একদৃষ্টিতে অখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তা ঠিক। লোককে জানানো উচিত নয়। তা হলে আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওঠ, উঠে পড়।

অখিল বললেন, দাঁড়া, এত হুড়োহুড়ি করে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। নে, একটা সিগারেট ধরা—

জহর বলল, তুই যখন জুলি কাকিমাকে—

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। বিশাল একটা থাপ্পড় কষাল অখিলের গালে। অখিল টলে পড়ে গেল।

জহর কাঁপতে কাঁপতে বলল, আর এক মিনিট দেরি করলে তুই আমার হাতে খুন হবি। যাবি না মরবি এখানে?

অখিল বলল, না, না, যাব—

জহর উঠে গিয়ে অখিলের বাজারের থলিটা ছুড়ে ফেলে দিল রাস্তার পাশের আস্তাকুঁড়ে। হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল।

অখিলকে বলল, যা, হাওড়া স্টেশনে চলে যা।

অখিল জহরের হাত জড়িয়ে বলল, যাচ্ছি, শুধু একটা অনুরোধ করব জহর? আমার মেয়ে দুটোর একটু খোঁজখবর নিবি?

জহর বলল, আজ থেকে তোর কোনও মেয়ে নেই। জয়া তোর স্ত্রী নয়।

এই কলকাতা, বাংলা, তোর নয়। এখান থেকে তুই মুছে যাবি। মনে থাকে যেন, আর কোনওদিন ফিরে আসা চলবে না।

অখিল উঠে গেল ট্যাক্সিতে।

জহর সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সেই অশ্রুতে সে তর্পণ করছে জুলি কাকিমার।

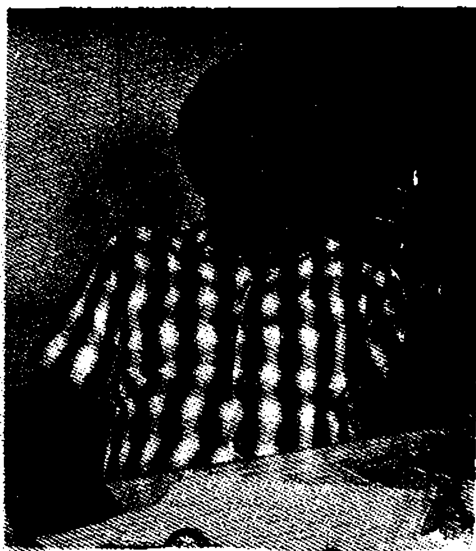
চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল শহর, ঝাপসা হয়ে গেল দুনিয়া। সে কিছুতেই সামলাতে পারছে না নিজেকে।

পথ দিয়ে যাচ্ছে অনেক নারী পুরুষ, একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাস্থ্যবান পুরুষ যে একা একা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ঝরাচ্ছে, তা লক্ষ করছে না কেউ। কিংবা দেখেও দেখছে না। জীবন চলছে নিজের নিয়মে।

একটা গাড়ি খুব কাছে এসে ব্রেক কষায় জহরের ঘোর ভাঙল। মুখ মুছতে মুছতে ভিজিয়ে ফেলল রুমাল।

তারপর সে পা বাড়াল একটা টেলিফোন বুথের দিকে। শ্রেয়া যদি সত্যি সত্যি তাকে নাটকের দলে নেয়, তা হলে মাঝে মাঝে দেখা হবে শ্রেয়ার সঙ্গে, অন্য একদল মানুষের সঙ্গে মিশবে। সেটাই হবে তার এক ধরনের নতুন জীবন।

—— ——



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ। শিক্ষা কলকাতায়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা।
বর্তমানে আনন্দবাজার সংস্থার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।
প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন এক সময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস: 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ: 'একা এবং কয়েকজন'। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার, ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫-তে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।
ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম— 'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী